অন্ত্য-লীলা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥ ২
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ৩
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥ ৪
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পঢ়ে রায় রামানন্দ॥ ৫
মধ্যেমধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৌরেন্দোঃ গৌরচন্দ্রস্য দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং যৈর্দৃষ্টং তেষাং মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সিংহদ্বারে পতন ও দিব্যোন্মাদ-প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। শ্রীলগৌরেন্দোঃ (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) অলৌকিকং (এবং অলৌকিক) দিব্যোন্মাদচেষ্টিতং (দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা) যৈঃ (যাঁহাদিগকর্ত্তৃক) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইয়াছে), তন্মুখাৎ (তাঁহাদের মুখে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের অত্যদ্ভুত এবং অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়া আমি (গ্রন্থকার) তাহা লিখিতেছি। ১

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলাদির উপাদান গ্রন্থকার কোথায় পাইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

২। **উন্মাদের চেষ্টা**—উন্মাদের আচরণ; উদ্‌ঘূর্ণা। **প্রলাপ**—চিত্রজল্পাদি। **উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ**—উন্মাদের চেষ্টা ও প্রলাপ।

৪। **করয়ে উদয়**—মনে উদিত হয়।

ভাবানুরূপ—প্রভুর ভাবের অনুরূপ (তুল্য)।

৫। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ হইতে এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থ হইতে প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ স্বরূপ-দামোদর কীর্ত্তন করেন। আর রামানন্দ-রায় প্রভুর ভাবের অনুকূল শ্লোক শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে উচ্চারণ করেন।

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা।
গোসাঞিরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেলা ॥ ৭
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সবরাত্রি প্রভু করে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণুগান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা পয়াণ ॥ ৯
তিন-দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥ ১০
সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাবীগণ।
তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥ ১১
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খোলিয়া ॥ ১২
তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ।
দীয়টী জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ। ১৩
ইতিউতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥ ১৪
পেটের ভিতর হস্ত-পদ— কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭। **দোঁহে**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দ।

ঘর গেলা—নিজেদের বাসায় গেলেন।

৮। প্রভুর সেবক গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ন করিলেন এবং প্রভু গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিলেন।

৯। **আচম্বিতে** ইত্যাদি—প্রভু উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি যেন শুনিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন। শুনামাত্রেই প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা যেমন সমস্ত ভুলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন, প্রভুও তেমনি গম্ভীরা হইতে বহির্গত হইয়া বেণুধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। **ভাবাবেশে**—রাধাভাবের আবেশে। **তাঁহা**—যে স্থান হইতে বেণুধ্বনি আসিতেছিল, সেইস্থানে। **পয়াণ**—প্রয়াণ, গমন।

এই পয়ারে প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণার কথা প্রকাশ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালেও দিব্যোন্মাদ বশতঃ তাঁহার বেণুধ্বনি শুনিতেছেন মনে করিয়া শ্রীরাধা যেমন অভিসারে বহির্গত হইতেন, প্রভুও তেমনি বহির্গত হইলেন।

১০। **তিনদ্বারে** ইত্যাদি—এই পয়ারের তাৎপর্য্য ২।২।৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। ছাদের উপরে উঠিবার দরজা দিয়া প্রভু উপরে উঠিয়াছিলেন; তারপর লাফাইয়া রাস্তায় পড়িয়া তৈলঙ্গ-গাভীগণ মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। "উর্দ্ধদ্বারেণ গৃহোপরিতন-গৃহং বিশ্য বহুস্থানান্যুল্লঙ্ঘ্য তৈলঙ্গকগোগণমধ্যে পতিত ইতিভাবঃ"—চক্রবর্ত্তি-পাদ।

তৈছে—সেইরূপ। যেইদিন প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের নিকটে পতিত হইয়াছিলেন এবং যেইদিন প্রভুর অস্থি-গ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, সেইদিনকার মত। অন্ত্য, ১৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। **সিংহদ্বারের দক্ষিণে**—জগন্নাথের সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে। **তেলেঙ্গা গাভীগণ**—তৈলঙ্গদেশীয় গাভীসকল। **তাঁহা**—গাভীগণের মধ্যে। **অচেতন**—সংজ্ঞা-শূন্য।

১২। এইদিকে, প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ না শুনায় গোবিন্দের সন্দেহ জন্মিল; তিনি কপাট খুলিয়া দেখিলেন যে প্রভু গম্ভীরায় নাই; অমনি স্বরূপ-দামোদরকে সংবাদ দিলেন।

১৩। **দীয়টী**—মশাল। সেইদিন বোধ হয় অন্ধকার রাত্রি ছিল।

১৪। **ইতি উতি**—এথানে ওখানে; নানাস্থানে।

১৫। তাঁহারা দেখিলেন, প্রভুর হস্তপদ সমস্তই যেন প্রভুর দেহের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে; এই অবস্থায়

অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহ্বল॥ ১৬
গাবীসব চৌদিগে শুঙ্খে প্রভু-অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥ ১৭
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥ ১৮
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥ ১৯
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥ ২০
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি।
স্বরূপে কহে—"তুমি আমা আনিলে কতি?॥২১
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুকে দেখিতে যেন একটী কূর্ম্মের (কচ্ছপের) মতন দেখাইতেছিল। আবার প্রভুর মুখে ফেন, দেহে রোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুধারাও দেখিলেন।

আশ্রয়-জাতীয়ভাবের বিক্রম সহ্য করিতে না পারাতেই ভাবের তাড়নে প্রভুর হস্ত-পদাদি দেহের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল। ৩।১৪।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। **অচেতন**—সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায়। **কুষ্মাণ্ড**—কুমড়া। **জড়িমা**—জাড্য, স্তব্ধতা। **অন্তরে**—প্রভুর চিত্তে। **আনন্দ-বিহ্বল**—আনন্দাধিক্য বশতঃ বিহ্বলতা।

১৭। **গাভীসব**—তৈলঙ্গা গাভীসকল। **চৌদিগে**—প্রভুর চারিদিকে থাকিয়া। **শুঙ্খে**—ঘ্রাণ লয়। শোঁকে, শুঙ্গে ও সোঁগে পাঠান্তরও আছে। **দূর কৈলে নাহি ছাড়ে**—গাভীগুলিকে তাড়াইয়া দিলেও যায় না।

১৮। প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে নাম-কীর্ত্তনাদিরূপ বহুবিধ চেষ্টায়ও যখন প্রভুর বাহ্য হইল না, তখন অচেতন অবস্থাতেই সকলে প্রভুকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।

২০। **হস্তপদ বাহিরাইল**—হস্তপদ পেটের ভিতর হইতে বাহির হইল। ভাবের তীব্রতা ছুটিয়া যাওয়াতে হস্ত-পদাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

২১। **চাহে ইতি উতি**—এদিকে ওদিকে চাইতে লাগিলেন; যেন কি, বা কাহাকে খুঁজিতেছেন। **স্বরূপে কহে** ইত্যাদি—যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া স্বরূপ-দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বরূপ! তোমরা আমাকে এই কোথায় আনিলে?" **কতি**—কোথায়। প্রভু, কি এবং কাহাকে খুঁজিতেছিলেন, পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

বুঝা যায়, দেহের-স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেও এখন পর্য্যন্ত প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি এসব কথা বলিতেছেন।

২২। প্রভু বলিতে লাগিলেন—"স্বরূপ! শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া আমি বৃন্দাবনে গেলাম; গিয়া দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন; বেণুর সঙ্কেত-ধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা অভিসার করিয়া কুঞ্জগৃহে আসিলেন; ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার সহিত বিলাসের অভিলাষে কুঞ্জের দিকে চলিলেন; আমিও শ্রীকৃষ্ণের পাছে পাছে চলিলাম; চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ভূষার মৃদু-মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ যেন মুগ্ধ হইয়া গেল। যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে গমন করিলেন, গোপীদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস ও বিহারাদি করিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিয়া এবং তাঁহাদের পরিহাস-বাক্যাদি শুনিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত উল্লসিত হইল। আমি আনন্দিত চিত্তে এসব শুনিয়া ধন্য হইতেছিলাম, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে এখানে লইয়া আসিলে, আমি তাঁহাদের অমৃত-মধুর পরিহাস-বাক্যাদি আর শুনিতে পাইলাম না, তাঁহাদের ভূষণের মধুর-শিঞ্জনও শুনিতে পাইলাম না, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিও শুনিতে

সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥ ২৩

তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাইলাম না। স্বরূপ! কেন তোমরা আমায় লইয়া আসিলে? সেই মনোমোহন মধুর-ধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ যে উৎকণ্ঠায় ছট্ ফট্ করিতেছে স্বরূপ!" ইহা উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ। ৩।১৪।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোষ্ঠে—বৃন্দাবনে।

২৩। **সঙ্কেত-বেণুনাদে**—বেণুনাদের সঙ্কেতে। **রাধা আনি**—রাধাকে আনিয়া। **কুঞ্জঘরে**—কুঞ্জগৃহে। **কুঞ্জেরে**—কুঞ্জের দিকে।

২৪। **তাঁর পাছে পাছে**—কৃষ্ণের পাছে পাছে। এস্থলে প্রভুর রাধাভাব নহে, মঞ্জরী-ভাব বা অন্য কোনও সখীর ভাব বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, তিনি দেখিলেন, রাধা কুঞ্জে গিয়াছেন। অথচ প্রথমে বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধার ভাবেই প্রভু বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; আর হস্তপদাদির দেহ-মধ্যে প্রবেশের দ্বারাও রাধা-ভাবের আবেশই অনুমিত হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত মোহন-ভাব প্রায়শঃ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার মধ্যেই উদিত হয়, অন্যত্র সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় না। "প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি। —উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩২॥" এই মোহনেরই একটা বৈচিত্রীর নাম দিব্যোন্মাদ; সুতরাং এই দিব্যোন্মাদ বৃন্দাবনেশ্বরী ব্যতীত অন্য গোপীতে সম্ভব নহে। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট না হইলে দিব্যোন্মাদের দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিক্রম মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিত না, এবং ঐ বিক্রমের প্রভাবে প্রভুর হস্ত-পদাদিও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিত না। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়াই গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি কেন তিনি মনে করিতেছিলেন যে—শ্রীরাধা কুঞ্জে গিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিলাসাদির নিমিত্ত কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং তিনি কৃষ্ণের পাছে পাছে চলিতে লাগিলেন?

সম্ভবতঃ উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃই রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর মনে পুনরায় মঞ্জরীভাব বা অন্য সখীর ভাব উদিত হইয়াছিল। শ্রীললিতমাধবের তৃতীয়াঙ্কেও দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্‌ঘূর্ণাবতী শ্রীরাধা নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিলেন—"হলা রাহে! মুঞ্চ অলি অমান দুল্ললিত্তণং—সখি রাধে! মুঞ্চ অলীকমান-দুর্ল্লিতত্বম্; সখি রাধে! অলীক-মান-দুর্ল লিতত্ব ত্যাগ কর।" আবার বলিলেন—"হলা রাহে! এসো দে পঅসদ্দ দিন্ন কণ্ণো কেলি-কুড়ুঙ্গে প্পবিসদি কহ্ণো—সখি রাধে! এস তে পদ-শব্দ-দত্তকর্ণঃ কেলি-নিকুঞ্জে প্রবিশতি কৃষ্ণঃ; সখি রাধে! তোমার পদ-শব্দে কর্ণ-সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলি-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।" ইহা বলিয়া শ্রীরাধা ললিতার পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া কৃষ্ণের নিকটে যাইবার নিমিত্ত অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। বলিলেন—সখি রাধে! শীঘ্র যাও, বৃথা সময় নষ্ট করিওনা, তোমার পাদনম্রা সহচরীকে আর ব্যথিত করিওনা—ন তুদ পাদলগ্নাং সহচরীম্। ৪৮॥

ললিতমাধবে শ্রীরাধার যে ললিতাভাব দেখা যায়, ইহাও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে হয়তো পূর্ব্ব এক লীলার কথা শ্রীরাধার মনে পড়িল—মনে পড়িল হয়তো সেই একদিনের কথা, যেই দিন তাঁহারই (শ্রীরাধারই) সহিত মিলনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জগৃহে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি মানবতী হইয়া কুঞ্জ হইতে দূরে অপেক্ষা করিতেছেন, কুঞ্জেও যাইতেছেন না; তখন ললিতা তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া কুঞ্জে যাওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। তখন ললিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, তিনি নিজেকেই অনুনয়-বিনয়-পরায়ণা ললিতা বলিয়া মনে করিলেন। এমন সময় ললিতাকে সম্মুখে দেখিয়াও প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ ললিতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না—

গোপীগণ-সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৫
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি ॥ ২৬
শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥ ২৭
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী—।
"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে' পঢ় রসায়ন শুনি ॥" ২৮
স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পঢ়ে মধুর করিয়া ॥ ২৯

তথাহি (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—
কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘ-মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ কিঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য সৌভাগ্যমিতি যদ্ যতঃ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তদ্দ্যোতক-শব্দ-শ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনঃ ত্বদনুভবেনেতি ভাবঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজেকে অনুনয়-বিনয়-পরায়ণা ললিতা মনে করায় ললিতাকেই শ্রীরাধা মনে করিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। সুতরাং শ্রীরাধার যে ললিতা-ভাব, তাহা রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সখীভাব বা মঞ্জরীভাব, তাহাও ললিতমাধবোক্ত উদাহরণের ন্যায় রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়; ইহাকে একটী স্বতন্ত্রভাব বলিয়া মনে হয় না।

ভূষাধ্বনি—ভূষণের (অলঙ্কারাদির) শব্দ। **শ্রবণ**—কর্ণ, কান।

২৫। **বিহার**—বিলাসাদি। **হাস**—হাসি। **পরিহাস**—নর্ম্মোক্তি। **কণ্ঠধ্বনি**—কথাদির শব্দ। **উক্তি**—কথাবার্ত্তা, পরিহাসবাক্যাদি। **কণ্ঠধ্বনি উক্তি**—কণ্ঠধ্বনি ও উক্তি। তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনিই মধুর, সর্ব্বদা শুনিতে ইচ্ছা করে; আবার তাঁহাদের পরিহাস-বাক্যাদিও অতি মধুর; মধুর কণ্ঠ-স্বরে যে মধুরতর পরিহাস-বাক্যাদি উচ্চারিত হয়, তাহার মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। **কর্ণোল্লাস**—কর্ণের উল্লাস, কানের আনন্দাতিশয়।

২৬। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

২৭। **না পাইলুঁ**—পাইলাম না। **সেই অমৃতসম বাণী**—অমৃতের ন্যায় মধুর তাঁহাদের নর্ম্ম-পরিহাসময়ী কথা। **ভুষণ-মুরলীর ধ্বনি**—ভূষণের শব্দ এবং মুরলীর শব্দ।

২৮। **ভাবাবেশে**—গোপীভাবের আবেশে।

কর্ণ তৃষ্ণায় মরে—স্বরূপ! আমার কর্ণ ভূষণের ও মুরলীধ্বনি শুনিবার তৃষ্ণায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

পঢ় রসায়ন— কর্ণ-রসায়ন শ্লোক পড়; যে শ্লোক শুনিলে কর্ণের তৃষ্ণা নিবারিত হইতে পারে, এমন কোনও শ্লোক পড়, আমি শুনি; কর্ণের তৃষ্ণা দূর করি। "পঢ় রসামৃত" পাঠও আছে। রসামৃত—লীলারসামৃত।

২৯। **প্রভুর ভাব জানিয়া**—যে ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের যে ভাব হইয়াছিল, প্রভুরও সেই ভাবের আবেশ হইয়াছিল।

ভাগবতের শ্লোক—পরবর্ত্তী "কাস্ত্র্যঙ্গ তে" ইত্যাদি শ্লোক।

মধুর করিয়া—সুরতান-যোগে, মধুর স্বরে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অঙ্গ (হে অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ)! ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) কা স্ত্রী (কোন্ স্ত্রীলোক) তব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(তোমার) কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা (মধুর পদযুক্ত বেণুগানে মোহিত হইয়া) আর্য্যচরিতাৎ (নিজধর্ম্ম হইতে) ন চলেৎ (বিচলিত হয় না) ? যৎ (যেহেতু) গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ (গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্যজন্তুগণ পর্য্যন্ত) ত্রৈলোক্য-সৌভগং (ত্রিভুবনের সৌভাগ্যস্বরূপ) ইদং চ রূপম্ (তোমার এই রূপ) নিরীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পুলকানি (পুলক সমূহ) অবিভ্রন্ (ধারণ করিয়াছে)।

অনুবাদ। হে অঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণ) ! ত্রিভুবনে এমন স্ত্রীলোক কে আছে, যে তোমার মধুর-পদামৃতযুক্ত বেণু-গানে মোহিত হইয়া নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? (স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, পুরুষজাতি) গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং বন্যজন্তুগণ পর্য্যন্ত (তোমার বেণুগান-শ্রবণে নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় এবং) ত্রিভুবন-সৌভাগ্য-স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকে। ২

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজসুন্দরীগণ যখন বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইলেন, তখন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পতিসেবাদি করার নিমিত্ত—পতিসেবাদিই যে কুলরমণী-দিগের প্রধান ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জন বনমধ্যে গভীর রজনীতে পরপুরুষের নিকটে অবস্থিতি যে তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে, তদ্বিষয়ও—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ক্ষোভে, দুঃখে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে **অঙ্গ**—স্বীয় অঙ্গের তুল্য, কি তদপেক্ষাও প্রিয় হে শ্রীকৃষ্ণ ! **ত্রিলোক্যাম্**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন ভুবনে কোন্ রমণী তোমার **কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা**—কল (মধুর ও অস্ফুট) পদরূপ অমৃত আছে যাহাতে সেই বেণুর গীতের দ্বারা সম্মোহিত (সম্যক্‌রূপে মোহিত) হইয়া **আর্য্যচরিতাৎ**—নিজধর্ম্ম, কুলধর্ম্মাদি হইতে, **ন চলেৎ**—বিচলিত না হয় ? অর্থাৎ তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া ত্রিভুবনের রমণীমাত্রেই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়—স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয় ; সুতরাং আমরা যে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া এস্থলে তোমার নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বিস্ময়জনক বা অস্বাভাবিক কিছুই তো নাই ? আমাদের এরূপ মনে করার হেতু কি, তাহাও বলি শুন। আমরা তো রমণী—তোমার সজাতীয়া রমণী, সুতরাং তোমার বেণুনাদে মোহিত হওয়া একরূপ প্রায় স্বাভাবিক ; কিন্তু বন্ধু, তোমার বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার এই **ত্রৈলোক্য-সৌভগম্**—ত্রিলোকের সৌভাগ্যস্বরূপ, ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌভাগ্যের উৎসস্বরূপ (ধর্ম্মনাশকত্বহেতু দুর্ভাগ্যের মূল নহে) অনির্ব্বচনীয় রূপ দেখিয়া **গো-দ্বিজদ্রুম-মৃগাঃ**—গো, দ্বিজ (পক্ষী), দ্রুম (বৃক্ষ) এবং মৃগসমূহও (বন্যজন্তুগণও) আনন্দাধিক্যে পুলকিত হইয়া থাকে, রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি স্থাবর জাতি ; কোনওরূপ মাধুর্য্যানুভবের শক্তি তাদের নাই ; সুতরাং মাধুর্য্যানুভবজনিত আনন্দ-পুলকের সম্ভাবনাও তাদের নাই ; বন্যপশু-আদিরও তদ্রূপ অবস্থা। তোমার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া তাহারাই যদি পুলকিত হইতে পারে —সুতরাং তাহাদের জাতিগত স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিতে পারে, তখন আমাদের কথা আর কি বলিব ? তোমার মাধুর্য্যের দ্যোতক তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া আমরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে তোমারই নিকটে থাকিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? আমাদের এরূপ আচরণ দেখিয়া অন্য স্ত্রীলোকগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে ভাবিতেছ ? কেহ উপহাস করিবে না ; কারণ, তোমার বেণুধ্বনি শুনিলে ত্রিলোকীস্থ সকল স্ত্রীলোকেরই আমাদের দশা হইবে—উপহাস করিবার আর কেহ থাকিবে না। তোমার রূপে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি ; কিন্তু বন্ধু, এই মুগ্ধত্ব তো গ্লানিজনক নয় ? ইহাতো অমঙ্গলজনক নয় ? দুর্ভাগ্য নয় ? ভোগ্যবস্তুর অনাবিল পরাকাষ্ঠা যাহা, তাহার আস্বাদনেই তো ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা, তাহাতেই ইন্দ্রিয়ের চরম-সৌভাগ্যের অভিব্যক্তি। ত্রিলোকে তোমার রূপের যে তুলনা নাই বঁধু ! তোমার এই অসমোর্দ্ধ-রূপমাধুর্য্যপানেই মাধুর্য্যাস্বাদন-স্পৃহার চরম-চরিতার্থতা—তাই তোমার রূপ **ত্রৈলোক্য-সৌভগম্**—ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌভাগ্যস্বরূপ ; ইহাই ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌন্দর্য্যাস্বাদন-স্পৃহার চরম চরিতার্থতা দান করিতে সমর্থ।

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা॥ ৩০
যথারাগঃ—
হৈল গোপীভাবাবেশ কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। **শুনি**—শ্লোক শুনিয়া।

অর্থ করিতে লাগিলা—পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুর কৃত অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

৩১। "হৈল গোপীভাবাবেশ" হইতে "রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন" পর্য্যন্ত ত্রিপদীতে, গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকৃত শ্লোকার্থের সূচনা করিতেছেন।

হৈল গোপীভাবাবেশ—প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলেন। যেই ভাবে গোপীগণ "কাস্ত্র্যঙ্গ তে" শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইলেন।

শারদীয়-মহারাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ যখন বনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন পরিহাসপটু রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ রসপুষ্টির অভিপ্রায়ে পরিহাস-সহকারে "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি বাক্যে গোপীদিগের প্রতি কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই কথাগুলি শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে। গোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় এই শ্লোকগুলির দুই রকম অর্থ করিয়াছেন—এক রকম অর্থে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা, তাঁহাদিগের প্রতি গৃহে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ, ইত্যাদি এবং অপর এক রকম অর্থে, বিলাসাদির নিমিত্ত গোপীদিগের অঙ্গীকার প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ কিন্তু উপেক্ষা-অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন—"গোপীগণ, তোমরা কুলবধূ, গৃহে ফিরিয়া যাও, যাইয়া পতি সেবাদি কর; ইহাই কুলবতীদিগের ধর্ম্ম।" ইহার উত্তরে গোপীগণ রোষভরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি বেণুধ্বনি করিয়া আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলে কেন? কোথায় এমন কোন্ রমণী আছে, যে নাকি তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়াও কুলধর্ম্মে থাকিতে পারে?"—এই ভাবাত্মকই "কাস্ত্র্যঙ্গ তে" শ্লোকটি। এই শ্লোকটির উচ্চারণ-সময়ে রাস-রজনীতে গোপীদিগের মনে যে ভাব ছিল, প্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন রাসস্থলীতে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।

কৈল রাসে পরবেশ—রাসে প্রবেশ করিলেন; প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া, যেন রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন—কৃষ্ণের উপেক্ষা-বচন শুনিয়া; "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিতেছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী—শ্রীকৃষ্ণের মধুর ও হাস্যযুক্ত বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যের সহিত, মধুর বাক্যেই গোপীদিগের প্রতি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর-হাস্যবাণীময় উপেক্ষা-বচন যেন প্রভু শুনিতেছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

ত্যাগে তাহা সত্য মানি—কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণীকে গোপীদিগের ত্যাগবিষয়ে সত্য মনে করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অর্থ দুই রকম—ত্যাগ ও অঙ্গীকার; এই দুই রকম অর্থ হইলেও গোপীগণ ত্যাগবিষয়ক অর্থই গ্রহণ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন।

নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়?॥ ধ্রু ॥ ৩২

কৈলা যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের রূপে, গুণে ও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া গোপীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গাঢ় অনুরাগ বশতঃ তাঁহারা মনে করিতেছেন,—এইমাত্র সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট আসিয়াছেন—তাঁহার প্রেমভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কি দুর্দ্দশা হইবে, প্রাণে বাঁচাই দায় হইবে, ইত্যাদি ভাবে তখন তাঁহাদের প্রাণ কম্পিত হইতেছিল, হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দ্ব্যর্থবোধক বাক্য শুনিলে, তাঁহার ত্যাগের কথা মনে আসাই গোপীদিগের পক্ষে স্বাভাবিক।

রোষে—ক্রোধে; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ঘরের বাহির করিয়া এখন ত্যাগ করিতেছেন, বলিয়া ক্রোধ। এই ক্রোধও কিন্তু দৈন্যের সহিত মিশ্রিত, সদৈন্য রোষ।

ওলাহন—মৃদু ভৎসনাসূচক বাক্য।

গোপীভাবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে ওলাহন দিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩২। প্রভু "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত-বেণুগীতসম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্" অংশের অর্থ করিতেছেন।

নাগর—হে নাগর শ্রীকৃষ্ণ। ইহা শ্লোকস্থ "হে অঙ্গ"-শব্দের অর্থ। **ত্রিজগত ভরি**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের মধ্যে। **যোগ্য নারী**—আকর্ষণ-যোগ্যা নারী; বিরুদ্ধ-সম্পর্কশূন্যা যুবতী রমণী। শ্রীকৃষ্ণের খুড়ী, পিসী, ইত্যাদি-স্থানীয়া বিরুদ্ধ-সম্পর্কীয়া রমণীগণ যদি যুবতীও হয়েন, তথাপি বংশীধ্বনি শুনিয়া কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত তাঁহাদের বাসনা জন্মে না। আবার অনুকূল সম্পর্কযুক্তা রমণী বৃদ্ধা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের নটবর বেশ দর্শনে যুবতীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া পড়েন। দ্বারকায় নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশ দর্শন করিয়া তাঁহার মাতামহী বৃদ্ধা পদ্মাবতী কামবেগ-বশতঃ বারংবার বাহুপ্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় ও অধরচালনের মুদ্রাদি দ্বারা চুম্বনের অভিনয় করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৭।৪০।)

কাঁহা না আকর্ষয়—কাহাকে আকর্ষণ করে না? অর্থাৎ সকলকেই আকর্ষণ করে; কেবল আমরাই যে আকৃষ্ট হইয়াছি, তাহা নহে।

বাস্তবিক, যুবতী-রমণীগণের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত-শ্রবণে, কি রূপদর্শনে, ইন্দ্র, মহাদেব এবং ব্রহ্মাদি পুরুষ দেবতাগণও মুগ্ধ হন—"সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিত-তত্ত্বাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৫।১৫॥"—ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণও হ্রস্ব, মধ্য ও দীর্ঘ ভেদক্রমে সেই সমস্ত গীতালাপ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হন। তৎকালে গীতধ্বনি-রাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হইয়া পড়ে, তাঁহারা সেই সমস্ত স্বরালাপের ভেদ নিশ্চয় করিতে পারেন না।

৩৩। কৈলা যত বেণুধ্বনি—হে কৃষ্ণ! তুমি যত বেণুধ্বনি করিয়াছ। "জগতে কৈলে বেণুধ্বনি" এইরূপ পাঠও আছে। **সিদ্ধমন্ত্রা**—সিদ্ধ হইয়াছে মন্ত্র যাঁহাদের; মন্ত্রে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইরূপ। **সিদ্ধ-মন্ত্রাদি**—মন্ত্রসিদ্ধা এবং অন্যান্য। **যোগিনী**—যোগবিদ্যাবতী। **সিদ্ধ-মন্ত্রাদি যোগিনী**—যাহারা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অথবা অন্য উপায়ে অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়াছে, এইরূপ যোগবিদ্যাবতী।

কৈলা যত ইত্যাদির **অন্বয়**—তুমি যত বেণুধ্বনি করিলে, তাহা সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনীর তুল্যা দূতী হইয়া নারীর মনকে মোহিত করে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুনিপুণা দূতী যেমন নায়কের নিকট হইতে নায়িকার নিকটে যাইয়া নানাবিধ মনোরম বাক্যে নায়িকাকে ভুলাইয়া নায়কের নিকটে লইয়া আসে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনিও তদ্রূপ গোপীদিগের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া যেন কৃষ্ণের নিকটে টানিয়া লইয়া আসে। যে সমস্ত যোগবিদ্যাবতী রমণী তাহাদের যোগ-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিম্বা অন্য উপায়ে যাহারা অলৌকিকী শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের বশীকরণী শক্তিকে যেমন কেহ বাধা দিতে পারে না, কৃষ্ণের বেণুধ্বনির বশীকরণী শক্তিকেও তদ্রূপ কেহ বাধা দিতে পারে না, সকলকেই তাহার মোহিনী-শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। মন্ত্রসিদ্ধা যোগিনী যদি দূতী হইয়া কোনও রমণীর নিকটে যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ রমণীকে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতেই হয়, মধুর কথায় পারুক, কি অলৌকিক শক্তিবলে পারুক, যেমন সেই যোগিনী সেই রমণীকে বশীভূত করিয়াই থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণের বংশীধ্বনিও নিজের মধুরতায় এবং অলৌকিকী শক্তিতে রমণী-মাত্রকেই ভুলাইয়া কৃষ্ণের নিকটে লইয়া আসে। সুতরাং গোপীদিগের স্বধর্ম্ম-ত্যাগে গোপীদিগের দোষ নাই—দোষ কৃষ্ণের বংশীরই।

মহোৎকণ্ঠা—কৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা। **বাড়াইয়া**—বৃদ্ধি করিয়া। **আর্য্যপথ**—কুলধর্ম্ম, স্বামি-সেবা আদি। **করে সমর্পণ**—বেণুধ্বনি সমর্পণ করে।

"নাগর! কহ তুমি" হইতে "করে সমর্পণ" পর্য্যন্ত:—গোপীভাবে মহাপ্রভু কৃষ্ণকে ওলাহন দিয়া সদৈন্যরোষের সহিত বলিলেন—"নাগর! আমরা কুলত্যাগিনী হইয়া এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে তোমার নিকটে আসিয়াছি বলিয়া তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছ, গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতি-সেবাদিতে মনোনিবেশ করার উপদেশ দিতেছ। কিন্তু! নাগর! তুমি একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখ দেখি, আমরা কি ইচ্ছা করিয়া কুলত্যাগ করিয়াছি? তোমার বেণুধ্বনিই তো আমাদিগকে কুলত্যাগ করাইয়াছে! তুমি বলিতে পার, বেণুধ্বনি শুনিয়া তোমরা ঘরের বাহির হইলে কেন? কিন্তু নাগর! বল দেখি, এই ত্রিজগতে এমন কোন্ যুবতী নারী আছে, তোমার বেণুধ্বনিতে যে নাকি আকৃষ্ট না হয়? যুবতী নারীর কথা ছাড়িয়া দেই, পুরুষ পর্য্যন্তও যে তোমার রূপে, তোমার বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৌর্ণমাসীর নিকটে আমরা শুনিয়াছি, অরণ্যবাসী কয়েকজন তপঃপরায়ণ মুনিও নাকি তোমার রূপাদিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মানুষের কথাও ছাড়িয়া দেই—তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদি (গো-দ্বিজদ্রুমমৃগাঃ) পর্য্যন্তেরও তো গাত্রে রোমাঞ্চের উদয় হইয়া থাকে নাগর! এ তো গেল মর্ত্ত্য জীবের কথা। পৌর্ণ-মাসীর মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণও নাকি তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়েন। নাগর! আমরা সাধারণ মানবী, তাতে আবার সরলা গোয়ালিনী; স্থাবর-জঙ্গম, এমন কি ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যখন তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া মোহিত হইয়া যায়েন, তখন আমাদের আর কথা কি নাগর! আমরা যে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? নাগর! তোমার বেণুধ্বনির অলৌকিকী শক্তি; কোন্ অবলা রমণীর এমন শক্তি আছে যে, বেণুধ্বনির এই অলৌকিক-শক্তির গতিরোধ করিবে? আমরা শুনিয়াছি, কোনও কোনও রমণী আছে, যাহারা যোগচর্য্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অলৌকিক-শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাদ্বারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাহারা করাইয়া লইতে পারে। আবার এমন রমণীও নাকি আছে, যাহারা বশীকরণ-বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে; তাহারা, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বশীভূত করিতে পারে। এইরূপ অলৌকিক যোগবল এবং বশীকরণ-বিদ্যায় দক্ষতা লইয়া যদি কোনও রমণী কোনও নাগরের দূতীরূপে কোনও নায়িকার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ নায়িকার এমন কি শক্তি আছে যে, সেই দূতীর মনোমুগ্ধকর বাক্য এবং যোগবলের ও বশীকরণ-বিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার না করিবে? তাহার সঙ্গে নাগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য না হইবে? নাগর! তোমার বেণুধ্বনিও যোগবলবতী এবং বশীকরণ-বিদ্যায় সুদক্ষা দূতীর মতই অলৌকিক-শক্তি ধারণ করিয়া থাকে; আমরা অবলা সরলা, গোয়ালিনী; আমরা কিরূপে তাহার শক্তিকে রোধ করিব? নিপুণা দূতী যেমন

ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে
লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায় ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার প্রভু-নাগরের গুণ-বর্ণনাদি দ্বারা সরলা নায়িকার মন ফিরাইয়া ফেলে, নাগরের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়, পরে তাহাকে কুলত্যাগ করাইয়া আনিয়া নাগরের নিকটে অর্পণ করে, তোমার বেণুধ্বনিও আমাদের কর্ণবিবর দ্বারা মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, তাহার মধুরতা ও অলৌকিক-শক্তিতে আমাদের চিত্ত হরণ করে, তোমার রূপ-গুণাদি উদ্দীপিত করিয়া তোমার সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত আমাদের চিত্তে এমন বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয় যে, আমরা আর স্থির থাকিতে পারি না—আমাদের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়—তখন দেহ, গেহ, স্বজন, আর্য্যপথ—সমস্তের কথাই আমরা ভুলিয়া যাই—তখন আমাদের সমগ্র চিত্তই তোমার রূপ-গুণাদিতে পরিপূর্ণ থাকে; হে নাগর! তোমার বেণুধ্বনি আমাদের এরূপ অবস্থা জন্মাইয়া, আমাদিগকে কুলত্যাগিনী করিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তোমার নিকটে অর্পণ করে; তুমিই বল তো নাগর! এমতাবস্থায় আমরা কি করিব? কি করিতেই বা পারি? কিরূপে আমরা কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি? নাগর! কুলধর্ম্ম ত্যাগের জন্য আমাদিগকে দোষ দেওয়া বৃথা—দোষ তোমার বেণুধ্বনির, তুমিই ইহা বিচার করিয়া দেখিতে পার।"

৩৪। **ধর্ম্ম ছাড়ায়**—কুলধর্ম্মাদি ত্যাগ করায় (কৃষ্ণ)। **বেণুদ্বারে**—বেণুর সহায়তায়; বেণুধ্বনি দ্বারা। **হানে**—নিক্ষেপ করে। "হান" পাঠও আছে। **কটাক্ষ**—তেরছা চাহনি। **কাম-শরে**—কামবাণ দ্বারা।

কটাক্ষ-কাম-শরে—কটাক্ষরূপ কামশর; কন্দর্পের শরে বিদ্ধ হইলে লোক যেমন কাম-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ দর্শন করিলেও রমণীকুল তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষাও অধিকতররূপে কাম-জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। তাই কটাক্ষকে কাম-শর বলা হইয়াছে। ব্রজ-সুন্দরীদিগের এই কাম-জ্বালা নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উৎকণ্ঠা-জনিত নহে; কামক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে প্রীতি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য কৃষ্ণ-বল্লভাদিগের চিত্তেও ক্রীড়াবাসনার তীব্রতা প্রয়োজন। ভোক্তার তীব্র ক্ষুধা এবং ভোক্তাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত পরিবেশকের তীব্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে ভোজন-রসের সম্যক্ আস্বাদন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে, লীলা-শক্তির প্ররোচনাতেই কৃষ্ণ-বল্লভাদিগের চিত্তে ক্রীড়াবাসনার উদ্ভব হয়। এই ক্রীড়াবাসনা শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যমূলক বলিয়া ইহাও প্রেমই, কাম নহে। আর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভাদিগের যে রহোলীলা, প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তবিক তাহা কামক্রীড়া নহে। "সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত-কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম-নাম ॥ ২।৮।১৭৪ ॥" কামক্রীড়ার সহিত বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপীদিগের প্রেমকে কাম বলা হয়। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।—ভঃ রঃ সিন্ধু। ১।২।১৪৩ ॥" **লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়**—কৃষ্ণ লজ্জা, ভয়াদি সমস্ত ত্যাগ করায়। **লজ্জা**—লোক-লজ্জা। **ভয়**—গুরুজনাদি হইতে ভয়।

এবে—এক্ষণে; আর্য্যপথ এবং লজ্জাভয়াদি ত্যাগ করাইবার পরে, এক্ষণে। **আমায় করি রোষ**—ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া ক্রোধ করিয়া। **কহি পতি-ত্যাগ দোষ**—আমি পতি-ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়া। **ধার্ম্মিক হঞা**—আমাকে ধর্ম্মাদি ত্যাগ করাইয়া এক্ষণে নিজে ধার্ম্মিক সাজিয়া। **ধর্ম্ম শিখায়**—কুলধর্ম্ম, সতী-ধর্ম্মাদি শিক্ষা দেয়। "ধর্ম্ম শিখাও" পাঠান্তরও আছে।

গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাত্মক কয়েকটী শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা। পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।২৪-২৬ ॥—"হে কল্যাণীগণ! অকপটচিত্তে স্বামীর সেবা এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনগণের অনুপোষণই স্ত্রীলোকদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। পতি যদি অপাতকী হন, তাহা হইলে ইহলোকে ও

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটী ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরলোকে অভিলাষিণী স্ত্রীগণ—তাহাকে কখনও ত্যাগ করিবে না; পতি যদি দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা ধনহীনও হয়, তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না; কুল-স্ত্রীগণের ঔপপত্য, স্বর্গহানিজনক, অযশস্কর, অচিরস্থায়িত্ব-হেতু অতি তুচ্ছ, দুঃখসাধ্য, ভয়াবহ ও নিন্দিত।"

"ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে" হইতে "ধর্ম্ম শিখায়" পর্য্যন্ত ত্রিপদী :—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কতক্ষণ ওলাহন দিয়া তাঁহার শঠতার কথা স্মরণপূর্ব্বক গূঢ় রোষভরে স্বগত ভাবে (অথবা, যেন পার্শ্ববর্ত্তিনী কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিজের উক্তির স্বাক্ষি-স্বরূপা, অথবা মধ্যস্থা বিচারিকা স্বরূপে মনে করিয়াই যেন) গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বলিতে লাগিলেন—"শঠের চাতুরী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। উনি (কৃষ্ণ) বেণুধ্বনি করিয়া—যে বেণুধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী দূতীর ন্যায় ত্রৈলোক্যবাসিনী সমস্ত রমণীকেই জোর করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে, সেই সর্ব্বনাশা বেণুর ধ্বনি করিয়া—আমাদের কুলধর্ম্ম ত্যাগ করাইলেন; আমাদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া নিজের নিকটে আনিয়া, বিলোলকটাক্ষ-শরে আমাদিগের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন—কাম-জ্বালার তীব্র হলাহল আমাদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া আমাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিলেন—লোকলজ্জা ত্যাগ করাইলেন—গুরুজনাদির ভয় ত্যাগ করাইলেন। নিজে এত সব করিয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া—সমস্ত কুল-ললনাদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এখন তিনি ধার্ম্মিক সাজিয়াছেন!! আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, আমাদিগকে দোষ দিতেছেন, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়াই গৃহত্যাগিনী হইয়াছি! আমরা পতি-সেবাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আমাদের উপরে দোষারোপ করিতেছেন, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়াই পতি-সেবাদি ত্যাগ করিয়াছি!! ধার্ম্মিক-চূড়ামণি সাজিয়া উনি এখন আমাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেছেন!! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?"

"হান" এবং "শিখাও" পাঠস্থলে, কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—"শঠ! তোমার চাতুরী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়! তুমি বেণুধ্বনি করিয়া—ইত্যাদি।"

৩৫। **অন্য কথা অন্য মন**—কথায় এক রকম, মনে আর এক রকম। **বাহিরে অন্য আচরণ**—আবার আচরণ অন্যরূপ। মনে, মুখে ও আচরণে, কোনওটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। **শঠ**—ধূর্ত্ত, গোপনে অনিষ্টকারী ব্যক্তি। **পরিপাটী**—কৌশল, চালাকী। যাহারা শঠ, তাহারা মুখে এক রকম বলে, মনে আর এক রকম ভাবে, আবার কাজে আর এক রকম করে। **তুমি জান পরিহাস**—তুমি পরিহাস বলিয়া মনে কর; তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাকে তুমি তোমার পরিহাস-বাক্য বলিয়া মনে করিতে পার। **হয় নারীর সর্ব্বনাশ**—কিন্তু তাহাতে নারীর (আমাদের) সর্ব্বনাশ হয়; কারণ, তোমার দ্ব্যর্থবোধক বাক্যকে তুমি পরিহাসোক্তি বলিয়া মনে করিলেও, সরলা নারী তোমার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তোমার পরিহাসকেই, যথাশ্রুত অর্থে, ত্যাগ মনে করিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করে। **কুটিনাটী**—কুটিলতা; মনে এক ভাব, কথায় বা কাজে অন্য ভাব।

"অন্য কথা অন্য কাজ" হইতে "এই সব কুটিনাটী" পর্য্যন্ত ত্রিপদী :—গোপীভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গূঢ় রোষভরে বলিলেন—"নাগর! তুমি একরকম কথা বল, মনে আর একরকম বিষয় ভাব; আবার কাজের বেলা অন্য আর একরকম কর; তোমার কথায়, কাজে ও চিন্তায় কোনটার সঙ্গেই কোনটার মিল দেখিতে পাই না। কিন্তু নাগর! এই সমস্ত তো সরল লোকের কাজ নহে? শঠতায় যাঁহারা অত্যন্ত দক্ষ, তাঁহাদেরই এইরূপ ব্যবহার। যদি বল "আমার কথায় ও কাজে অমিল কোথায় দেখিলে তোমরা?" তাহাও দেখাইয়া দিতেছি। বস্ত্র-হরণের

বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃতসমান মিঠাবোলে,
অমৃতসমান ভূষণ শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিন তুমিই না নাগর ! গোপীগণকে বলিয়াছিলে, "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ—অবলাগণ, তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে ব্রজে গমন কর ; আগামিনী রজনী-সমূহে আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে।" এই তো ছিল তোমার মুখের কথা। তারপর বংশীধ্বনি করিয়া আমাদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া বনে আনিলে, আনিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ, আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছ ; এই তো তোমার আচরণ ! তোমার কথায় আর কাজে মিল কোথায় বলত, শঠচূড়ামণি ! আর তোমার মনের কথা তুমি জান ; আমাদের মনে হয়, আমাদিগকে কুলত্যাগিনী করা, কলঙ্কিনী করাই তোমার মনের অভিপ্রায় ছিল। মনে, মুখে, কাজে তোমার কোথাও মিল নাই। বলি নাগর ! আমাদের ন্যায় সরলা অবলার সঙ্গে এত শঠতা, এত কুটিলতার কি প্রয়োজন ছিল ? এখন তুমি হয়তো বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কেবল পরিহাস করিয়াই বলিতেছ—তোমার কথার যথাশ্রুত অর্থেই ত্যাগ বা উপেক্ষা বুঝাইতেছে, বাস্তবিক আমাদিগকে ত্যাগ করার অভিপ্রায় তোমার নাই। কিন্তু নাগর ! তোমার কথার গূঢ় অর্থে যদি পরিহাসই বুঝায়, তাহা আমরা —সরলা অবলা আমরা—কিরূপে বুঝিব ? আমরা তোমার ধর্ম্মোপদেশের যথাশ্রুত অর্থ বুঝিয়াই নিজেদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেছি—তাই অসহ্য যাতনায় মৃতপ্রায় হইতেছি। নাগর ! তোমার এসব কুটিলতা ত্যাগ কর ; আমরা সরলা অবলা, আমাদের সঙ্গে কুটিলতা করা তোমার শোভা পায়না নাগর !"

৩৬। **বেণুনাদ**—বেণু-ধ্বনি।

বেণূনাদ-অমৃত-ঘোলে—বেণুনাদ-রূপ অমৃত ঘোলে।

অমৃত-ঘোলে—অমৃত হইতে জাত ঘোল (মাঠা)। সাধারণতঃ দধি হইতেই ঘোল প্রস্তুত হয় ; ঘোল অত্যন্ত স্নিগ্ধ, দেহের সন্তাপ-নাশক। কিন্তু অমৃত হইতে যদি ঘোল প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে সেই ঘোলে অমৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদও থাকিবে, আর তাহা দেহ ও মন উভয়েরই সন্তাপনাশক হইবে এবং সাধারণ দধি-জাত ঘোলের অপেক্ষা তাহা অধিকতর স্নিগ্ধও হইবে। বেণু-ধ্বনির মধুরতা এবং দেহ-মনের সন্তাপ-নাশকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় বেণুনাদকে অমৃতঘোল বলা হইয়াছে। বেণু-ধ্বনি অমৃতের ন্যায় মধুর ; এই মধুরতার আরও একটী বিশেষত্ব আছে ; স্বর্গবাসীরাই অমৃত পান করিয়া থাকে ; ভোগে স্বর্গবাসীদের বিতৃষ্ণা জন্মে না— মর্ত্ত্যলোকে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে ; বেণুনাদের যে মধুরতা, তাহা মর্ত্ত্যবাসীর আস্বাদ্য মধুরতার ন্যায় বহুক্ষণ আস্বাদনের পরে বিতৃষ্ণা জন্মায় না ; ইহা স্বর্গবাসীদের আস্বাদ্য অমৃতের ন্যায় ভোগের তৃষ্ণা বরং বাড়াইয়া দেয় ; বেণুধ্বনি যতই শুনা যায়, ততই শুনিতে ইচ্ছা হয় ; তাই আস্বাদন-বিষয়ে বেণুনাদের সঙ্গে অমৃতের সাদৃশ্য আছে। তারপর সন্তাপ-হারকতার কথা। বস্ত্র-হরণের দিন "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ—আগামিনী রজনীসমূহে আমার সহিত তোমরা রমণ করিতে পাইবে" বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের হৃদয়ে একটা আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই গোপীগণ তাঁহার প্রতিশ্রুত রাত্রিসমূহের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; এই আশার ঘৃতাহুতি পাইয়া তাঁহাদের মিলনেচ্ছারূপ অগ্নি উৎকণ্ঠা-জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, মিলনোৎকণ্ঠার তীব্রতাপে তাঁহাদের মন-প্রাণ বিশেষরূপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। রাস-রজনীতে বেণু-ধ্বনিযোগে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান পাইয়া আশু মিলন নিশ্চিত জানিয়া তাঁহাদের সন্তাপ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়াছিল—নিদাঘ-তপ্ত পিপাসাতুর ব্যক্তির সন্তাপ যেমন ঘোলপানে প্রশমিত হয়। তাই বেণু-ধ্বনিকে ঘোলের তুল্য বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি অমৃত হইতে জাত ঘোলের ন্যায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় এবং দেহ-মনের সন্তাপ-নাশক।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মিঠা—মিষ্ট। **বোলে**—বচনে, কথায়। **অমৃত সমান মিঠা-বোলে**—অমৃতের ন্যায় মধুর বাক্য। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের স্বর মধুর, নর্ম্ম-পরিহাসময় বলিয়া প্রতি কথা মধুর, প্রতি অক্ষরও মধুর। **ভূষণ-শিঞ্জিত**—অলঙ্কারের ধ্বনি ; অঙ্গ-সঞ্চালনের সময়ে অলঙ্কারাদির যে মৃদুমধুর শব্দ হয়, তাহাকে শিঞ্জিত বলে। **অমৃত সমান ভূষণ-শিঞ্জিত**—কৃষ্ণের ভূষণ-ধ্বনিও অমৃতের ন্যায় মধুর। **তিন অমৃতে**—বেণুনাদরূপ অমৃত, বচনরূপ অমৃত এবং ভূষণ-ধ্বনিরূপ অমৃত, এই তিন অমৃতে। মধুর বেণুনাদে, মধুর বচনে এবং মধুর ভূষণ-ধ্বনিতে। **হরে কান**—কর্ণকে হরণ করে ; অন্য শব্দ শুনিতে না দিয়া কানকে কেবল ঐ তিনটী শব্দ শুনিবার কাজেই নিয়োজিত করে। যিনি একবার শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, এবং তাঁহার ভূষণ-ধ্বনি শুনিয়াছেন, অন্য কোনও শব্দ শুনিবার জন্যই আর তাঁহার ইচ্ছা থাকে না, অন্য কোনও শব্দ তিনি শুনিতেও পায়েন না—কেবল শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ঐ তিনটী শব্দ বা তাহাদের কোনও একটী শুনিবার নিমিত্তই তাহার উৎকণ্ঠা জন্মে এবং সর্ব্বদাই কানে যেন ঐ তিনটী বা তাহাদের কোনও একটীই তিনি শুনিতে পান। ঐ তিনটী শব্দ যেন তাঁহার কানের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে।

হরে মন হরে প্রাণ—ঐ তিন অমৃত মন ও প্রাণকে হরণ করে। যিনি একবার ঐ তিনটী শব্দ শুনিয়াছেন, তাঁহার মন-প্রাণ সর্ব্বদাই ঐ তিনটী শব্দেই ভরপুর হইয়া থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই তিনি আর মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে পারেন না। **চিত**—চিত্ত, মন। **কেমনে নারী** ইত্যাদি—যাহার মন, প্রাণ, কান সমস্তই অপহৃত হইয়া যায়, সেই রমণী আর কিরূপে চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে? তিনি কিরূপে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন?

"বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে" হইতে "ধরিবেক চিত" পর্য্যন্ত ত্রিপদীঃ—"নাগর! তোমার বেণুধ্বনি আমাদের দেহের এবং মনের সমস্ত সন্তাপ দূর করিয়া অমৃতোপম মধুরতায় আমাদের প্রাণ-মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকেই হরণ করিয়াছে; তোমার অমৃতমধুর কণ্ঠস্বর এবং সনর্ম্মরস-সূচক বাক্যাদি এবং তোমার অমৃত-মধুর-ভূষণ-ধ্বনি—ইহারাও আমাদের প্রাণ-মন-আদি ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করিয়াছে; আমাদের ইন্দ্রিয়াদি এখন আর আমাদের বশে নাই, সমস্তই তোমার বেণু, কণ্ঠ ও ভূষণের ধ্বনিবিষয়ে নিয়োজিত। নাগর! তুমি যে আমাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতি-সেবাদি করিতে উপদেশ দিতেছ, তাহা আমরা কিরূপে করিব নাথ! পতি-আদির কথা যদি শুনিতে পাই, তাহা হইলেই তো তাঁহাদের আদেশানুসারে তাঁহাদের সেবা করিতে পারিব? কিন্তু নাথ, তাহা তো আমরা শুনিতে পাইনা, পাইবওনা; কারণ, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যে তোমার বেণুধ্বনি-আদি শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, আমাদের কর্ণ এখন আর তোমার বেণুধ্বনি, তোমার কণ্ঠ-ধ্বনি, তোমার ভূষণ-ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই যে শুনিতে পায়না। অন্য কাহারও কথা শুনিলেও মনে হয়, তোমার কণ্ঠস্বরই শুনা যাইতেছে, তাহার কথার স্বরূপ গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে; দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়, তাহা শুনিলেও মনে হয়, যেন তোমার বেণুধ্বনিই শুনা যাইতেছে; কোনও অব্যক্ত মৃদু শব্দ শুনিলেও মনে হয়, তোমার ভূষণধ্বনিই শুনা যাইতেছে। নাথ! তোমার এই তিনটী ধ্বনি যেন আমাদের কানের ভিতর বাসা করিয়া রহিয়াছে, আমরা কিরূপে পতি-আদির আদেশ শুনিয়া তাহাদের সেবা করিব, নাথ! বলিতে পার, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেবা করিবে। তাহাও যে নাগর, আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে মনের একাগ্রতার প্রয়োজন; কিন্তু নাগর! আমাদের মন তো আমাদের বশে নাই, তোমার ধ্বনিত্রয়েই মন নিবিষ্ট হইয়া আছে। আর অন্যান্য ইন্দ্রিয় তো মনেরই অনুগত; মন যেখানে, তাহারাও সেখানেই। কিরূপে আমরা পতি-সেবা করিব, নাগর! আমরা যে জোর করিয়া আমাদের চিত্তকে গৃহকর্ম্মাদিতে ধরিয়া রাখিব, সেই শক্তিও আমাদের নাই, নাথ! দেবীগণও তোমার বেণুধ্বনির অসাধারণ শক্তিকে রোধ করিতে পারেনা; আমরা তো সাধারণ মানবী, কিরূপে আমরা তাহার প্রতিকূলে কাজ করিতে সমর্থ হইব?"

এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পঢ়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৩৭

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—
নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জলদেত্যেকেন। হে সখি! স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি। স্বশব্দেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ? নদজ্জলদেতি। নদতো জলদস্য নিস্বন ইব নিস্বনঃ কণ্ঠধ্বনির্যস্য গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? শ্রবণ-কর্ষি কর্ণকর্ষি সদুত্তমং শিঞ্জিতং ভূষণানাং ধ্বনির্যস্য সঃ। ভূষণানান্তু শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরতএব সরসসূচকৈঃ। কিম্বা সনর্ম্মরসস্য সূচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতং অন্যেষাং বচনানি বা রসসূচকানি স্যুঃ কৃষ্ণস্য বচনানামক্ষরাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি। তৈর্জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থভঙ্গী অর্থকৌশলম্। কিম্বা সনর্ম্মরসসূচিকান্ ক্ষরতি শ্রবণকৃতাং হৃদয়ান্ন নির্যাতীত্যক্ষরপদানাং যা অর্থভঙ্গী সোক্তৌ যস্য। কিম্বা সৈবোক্তির্যস্য। যদ্বা, রসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য। যদ্বা, সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ সমুদ্রঃ অর্থান্নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তদ্রূপোক্তির্যস্য সঃ। পুনঃ রমাদিকানামুত্তমস্ত্রীণাং হৃদয়হারী বংশ্যাঃ কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যস্য সঃ। বয়ন্তু মানুষ্যস্তত্রাপি যুবত্যঃ অর্ব্বাচীনাঃ তত্রাপি সজাতীয়াঃ তত্রাপি তস্য সম্ভোগ্যাঃ তস্য বাঞ্ছনীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতস্তৎকর্ত্তৃকমস্মচ্চিত্তাকর্ষণং কিং বিচিত্রমিতি। সদানন্দবিধায়িনী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পর্য্যন্তই প্রভুর উক্তি শেষ হইল। গ্রন্থকার নিজের কথায় প্রভুর চেষ্টা বর্ণনা কবিতেছেন।

৩৭। **এত কহি ক্রোধাবেশে**—রোষের আবেশে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ বলিয়া (প্রভু)। **ভাবের তরঙ্গে ভাসে**—প্রভু গোপীভাবে যেন আপ্লুত হইলেন। **উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন**—শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত প্রভুর চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল। **রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী**—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা। পরবর্ত্তী "নদজ্জলদনিস্বনঃ' ইত্যাদি শ্লোক। **বাখানি**—ব্যাখ্যা করিয়া। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুকৃত শ্লোকব্যাখ্যা উক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর, যাঁহার শ্রুতিমধুর ভূষণধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার বাক্য সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত এবং পদার্থভঙ্গিময়, যাঁহার বংশীধ্বনি রমাদি-বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারী, সেই মদন-মোহন আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। ৩

নদজ্জলদনিস্বনঃ—নাদ (শব্দ) করিতেছে যে জলদ (মেঘ), তাহার নিস্বনের ন্যায় নিস্বন (শব্দ) যাঁহার; মেঘের শব্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ যাঁহার, সেই মদনমোহন। "নদন্নবঘনধ্বনিঃ"-এরূপ পাঠান্তরও আছে; অর্থ একই; নাদ করিতেছে এরূপ নবঘনের (নূতন মেঘের) ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি যাঁহার। **শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ**—শ্রবণকে (কর্ণকে) আকর্ষণ করে এরূপ সং (উত্তম) শিঞ্জিত (ভূষণধ্বনি) যাঁহার; যাঁহার ভূষণের সুমধুর ধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে—শুনিবার নিমিত্ত কর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়। "শ্রবণহারিসংশিঞ্জিতঃ"-এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই; শ্রবণকে হরণ (মুগ্ধ) করে, এরূপ সংশিঞ্জিত যাঁহার। **সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ**—নর্ম্মের (পরিহাসের) সহিত বর্ত্তমান যে রস, সেই রসের সূচক (দ্যোতক) অক্ষরের (শব্দের বা পদের) এবং পদার্থের (পদের অর্থের) ভঙ্গী (কৌশল) যুক্ত উক্তি (বাক্য) যাঁহার; যাঁহার বাক্যের অর্থ, এমন কি শব্দ এবং অক্ষরগুলিও নর্ম্মরসে পরিপূর্ণ;

অস্যার্থঃ ; যথারাগঃ—
কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবে জগতের কাণে,
পুন কাণ বাহুড়ি না আয়॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহার উচ্চারিত সমস্ত বাক্যের মর্ম্মও সরস-নর্ম্মময়, শব্দ এবং অক্ষরগুলিও নর্ম্মরসের পরিচায়ক। "সনর্ম্মবচনামৃতৈঃ স্নপিতকামিনীমানসঃ"—এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; অর্থ—যাঁহার পরিহাসময় বচনরূপ অমৃতদ্বারা কামিনীদিগের মানস (মন) স্নপিত (রসনিষিক্ত) হয় ; যাঁহার নর্ম্ম পরিহাসে সমুজ্জ্বল বাক্য শুনিলে কামিনীদিগের চিত্তে রসের হিল্লোল বহিতে থাকে। **রমাদিক-বরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ**—রমা (লক্ষ্মী) আদি বরাঙ্গনাদিগেরও (শ্রেষ্ঠ রমণীদিগেরও) হৃদয়কে (চিত্তকে) হরণ করিতে সমর্থ যাঁহার বংশীর (বাঁশীর) কল (মধুর ও অস্ফুটধ্বনি) ; আমাদের (গোপীদিগের) ন্যায় মনুষ্যজাতীয়া অর্ব্বাচীনা—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয়া সুতরাং সম্ভোগযোগ্যা—তরুণীদিগের কথা তো দূরে,—যাঁহার বাঁশরীর অস্ফুট-মধুর ধ্বনি শুনিলে লক্ষ্মী-আদি বৈকুবাসিনীদের, স্বর্গস্থা দেবনারীদের চিত্তপর্য্যন্তও বিচলিত হইয়া পড়ে, সেই মদনমোহন স্বীয় শব্দদ্বারা আমার (শ্রীরাধার) কর্ণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

৩৮। এক্ষণে শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু "নদজ্জলদনিস্বনঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমতঃ "নদজ্জলদনিস্বনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, "কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি" ইত্যাদি দ্বারা।

কণ্ঠের গম্ভীর-ধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের গম্ভীর-ধ্বনি। **নবঘন**—নূতন মেঘ। **নবঘন-ধ্বনি**—নূতন মেঘের শব্দ। **নবঘন-ধ্বনি জিনি**—নবঘন-ধ্বনিকেও জয় করে যে। শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-ধ্বনির গম্ভীরতা নূতন মেঘের ধ্বনির গম্ভীরতাকেও পরাজিত করে। **যার গুণে**—শ্রীকৃষ্ণের যে কণ্ঠ-ধ্বনির গুণে। **কোকিল লাজায়**—কোকিলও লজ্জিত হয়। ইহাতে কৃষ্ণ-কণ্ঠ-ধ্বনির মধুরতা সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি নবমেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর এবং কোকিলের ধ্বনি অপেক্ষাও মধুর।

তার—কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনির। **শ্রুতি**—শ্রবণ, শুনা। **শ্রুতি-কণে**—যাহা শ্রুত হয়, তাহার কণিকায়। **তার এক শ্রুতি কণে**—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর যাহা শ্রুত হয় (শুনিতে পাওয়া যায়), তাহার এক কণিকায়। **ডুবে জগতের কাণে**—জগদ্‌বাসী সকলের কানই ডুবিয়া যায়। "ডুবে" শব্দের তাৎপর্য্য এই :- কোনও বস্তু জলে ডুবিয়া গেলে তাহার উপরে, নীচে, আশে পাশে সর্ব্বত্রই যেমন জল থাকে, জল ব্যতীত অন্য কোনও জিনিসের সহিতই যেমন তাহার স্পর্শ হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের—সমস্তের প্রয়োজন হয় না, তাহার—এই কণিকাতেই সমস্ত জগদ্বাসীর—দু'এক জনের নয়, সকলেরই—কানের এমন অবস্থা জন্মাইতে পারে যে, তাহাদের কাহারও কানের সঙ্গেই আর অন্য শব্দের সংশ্রব কখনও হইতে পারে না—তাহারা কেহই কোনও সময়েই আর অন্য কোনও শব্দ শুনিতে পায় না, সর্ব্বদাই তাহারা কেবল কৃষ্ণ-কণ্ঠের শব্দই শুনিতে পায় ; যখন কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরের সান্নিধ্যে থাকে, তখন তো শুনেই, যখন কৃষ্ণের নিকট থাকে না, কি কৃষ্ণ কথাদি বলেন না—তখনও যেন তাহাদের কানে কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরই শ্রুত হইতে থাকে।

বাহুড়ি—ফিরিয়া। **না আয়**—আইসে না। **পুন কান** ইত্যাদি—কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি হইতে জগদ্বাসীর কান আর ফিরিয়া আসে না। একবার যে ব্যক্তি কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পায়, অন্য শব্দের প্রতি তাহার আর কোনও সময়েই অনুসন্ধান থাকে না—কৃষ্ণের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেও না।

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি" হইতে "বাহুড়ি না আয়" পর্য্যন্ত :—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বিশাখা-জ্ঞানে শ্রীরামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সখি ! নূতন মেঘের যে ধ্বনি, তাহার গম্ভীরতাই লোকের নিকটে

কহ সখি ! কি করি উপায় ? ।
কৃষ্ণের সে শব্দগুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু ॥ ৩৯

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায় ।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

আদর্শস্থানীয় ; কিন্তু সখি ! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের গম্ভীরতার নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ। আর—এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার শব্দের মধুরতার সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠ-স্বরের মধুরতার তুলনা হইতে পারে ; কিন্তু সখি ! কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মধুরতা দেখিয়া যেন কোকিলও লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকে। কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের গম্ভীরতা ও মধুরতার তুলনা কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরই, ইহার আর অন্য তুলনা নাই সখি ! ইহার শক্তিও সখি, অদ্ভুত ! সরোবর বা নদীর কথা তো দূরে, একটা আস্ত সমুদ্রও বোধহয়, সমস্ত জগদ্বাসীকে ডুবাইয়া রাখিতে পারে না—পারিলেও কেহ কেহ হয়তো সাঁতার দিয়া সমুদ্র ছাড়িয়া তীরে উঠিতে পারে ; কিন্তু সখি ! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরের সমস্তটার প্রয়োজন হয় না—তাহার এক ক্ষুদ্র কণিকাই সমস্ত জগদ্বাসীর কানকে এমন ভাবে ডুবাইয়া রাখিতে পারে যে, কাহারও কানই আর তাহাকে (স্বর-কণিকাকে) ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পারে না—চেষ্টা করিলেও তীরের সন্ধান পাইবে না। সখি ! একবার যাহার কানে কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরের সামান্য একটুকুও প্রবেশ করে, তাহার কানে আর অন্য শব্দের স্পর্শ হইতে পারে না, সে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্ব্বদাই যেন কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরই শুনিতে পায়। হায় সখি ! আমি কখন কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাইব ? উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ যে যায় সখি !”

এস্থলে কেবল কণ্ঠের “ধ্বনির” মধুরতার কথাই বলা হইল ; এই মধুর কণ্ঠধ্বনির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহার মধুরতার কথা পরে বলা হইবে (৩।১৭।৪১ পয়ারে)।

৩৯। **কহ সখি !** ইত্যাদি—রায়-রামানন্দকে বিশাখা-সখী মনে করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিলেন—“সখি ! কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি কৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠ ধ্বনি শুনিতে পাইব, তাহা আমাকে বলিয়া দাও।”

শব্দগুণে—শব্দের গম্ভীরত্ব ও মাধুর্য্যগুণে। **মরি যায়**—কান মরিয়া যায়।

“সখি ! আমাকে বলিয়া দাও, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি কৃষ্ণের সেই মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইব—যাহা নবমেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর, যাহা কোকিলের স্বর অপেক্ষাও মধুর, এবং যাহার এক কণিকাই সমস্ত জগৎকে ডুবাইতে সমর্থ ! সখি ! কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনির গম্ভীরতায়, মধুরতায় এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতায় আমার কান যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে, অন্য শব্দ আর আমার কান গ্রহণ করিতে অসমর্থ—কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি শুনিবার নিমিত্তই আমার কান উৎকণ্ঠিত—জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যস্থলে উপস্থিত কোনও লোকের, জলপানের নিমিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠা হয়, জল না পাইলে পিপসার তাড়নায় তাহার যেমন প্রাণ বহির্গত হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, সখি ! কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি শুনিবার তীব্র উৎকণ্ঠায় আমার কানেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। বল সখি ! আমি কি করিব ?”

৪০। কণ্ঠধ্বনির কথা বলিয়া এক্ষণে শ্লোকস্থ “শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ” অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারাদির ধ্বনি-মধুরতা বর্ণনা করিতেছেন।

নূপুর কিঙ্কিনীধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের চরণের নূপুরের ধ্বনি এবং কটির কিঙ্কিনীর ধ্বনি। **কিঙ্কিনী**—মালার আকারে গ্রথিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহ ; ঘুঙ্গুর। **হংস-সারস-জিনি**—হংস ও সারসকে পরাজিত করে যাহা। শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের এবং কিঙ্কিনীর মধুর-ধ্বনি, হংস এবং সারসের ধ্বনির মধুরতাকেও পরাজিত করে। **কঙ্কণ ধ্বনি**—কঙ্কণের শব্দ। **কঙ্কণ**—এক রকম অলঙ্কার, ইহা হাতের মণিবন্ধে (হাতের তালুর ঊর্দ্ধদেশে) ব্যবহার করা হয়। **চটক**—এক রকম ক্ষুদ্র পাখী, চড়ুই ; ইহার শব্দ অতি মধুর ও মৃদু। **লাজায়**—লজ্জিত করে।

সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কণ-ধ্বনির মৃদুতা ও মধুরতা দেখিয়া নিজের শব্দের মৃদুতার হেয়তা বুঝিতে পারিয়া চটক লজ্জিত হয়।

একবার যেই শুনে—কৃষ্ণের নূপুর, কিঙ্কিনী এবং কঙ্কণের ধ্বনি যে একবার শুনিতে পায়। **ব্যাপি রহে তার কাণে**—ঐ ধ্বনি তাহার কাণকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখে; সমস্ত কাণকেই অধিকার করিয়া রাখে। **অন্য শব্দ** ইত্যাদি—নূপুরাদির ধ্বনিতে সমস্ত কাণ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া অন্য কোন শব্দই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না; যেমন যে জায়গায় একটী দালান আছে, ঠিক সেই জায়গায় আর একটী দালান থাকিতে পারে না।

"নূপুর কিঙ্কিনী ধ্বনি" হইতে "সে কাণে না যায়" পর্য্যন্ত :—

"সখি! শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারের ধ্বনির যে মধুরতা, তাহার তুলনা তো জগতে মিলে না, কিসের সঙ্গে তুলনা দিয়াই বা তোমাকে তাহা বুঝাইব? হংস এবং সারসের ধ্বনি, নূপুর-কিঙ্কিনীর ধ্বনির মতনই মধুর বলিয়া লোকে বলে; কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের নূপুর-কিঙ্কিনীর-ধ্বনির নিকটে যে তাহা অতি তুচ্ছ! সখি! চটক-পাখীর মৃদু মধুর ধ্বনিও কঙ্কণের ধ্বনির মতনই মধুর বলিয়া তোমরা বল; কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কণের ধ্বনির সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? কৃষ্ণের কঙ্কণের ধ্বনি শুনিয়া চটক যে নিজের হেয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় নিতান্ত ছোট হইয়া যায় সখি! কিসের সঙ্গে কৃষ্ণের অলঙ্কারের ধ্বনির তুলনা দিব? যে ভাগ্যবতী একবার মাত্র কৃষ্ণের অলঙ্কারের মধুর শব্দ শুনিতে পায়, ঐ শব্দ যেন তখন হইতে সর্ব্বদাই তাহার সমস্ত কাণ জুড়িয়া বসিয়া থাকে। সখি, কাণে আর অন্য কোনও শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না। সখি! কৃষ্ণের মধুর অলঙ্কার-ধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত; বল সখি! কিরূপে আমি সেই শব্দ শুনিতে পাইব?"

৪১। এক্ষণে, শ্লোকস্থ "সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ"-অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উচ্চারিত "বাক্যের" মধুরতার কথা বলিতেছেন।

শ্রীমুখ—শ্রীযুক্ত মুখ; পরমশোভাযুক্ত মুখ। **ভাষিত**—কথা। **সে শ্রীমুখভাষিত**—শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম-শোভাযুক্ত মুখের কথা। **পরামৃত**—শ্রেষ্ঠ অমৃত, অপ্রাকৃত অমৃত। **অমৃত হৈতে পরামৃত**—স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ অমৃত, বহুগুণে বেশী আস্বাদ্য, মধুর। **স্মিতকর্পূর**—স্মিত (মন্দহাসি)-রূপ কর্পূর। শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-হাসিকে শুভ্র ও সুগন্ধি কর্পূরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **তাহাতে**—শ্রীমুখভাষিতরূপ পরামৃতের সঙ্গে।

অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে কর্পূরের সৌগন্ধে যেমন অমৃতের লোভনীয়তা বর্দ্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর কথার সঙ্গে তাঁহার মধুর মন্দহাসির যোগ থাকাতে ঐ কথার লোভনীয়তাও তদ্রূপ সমধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কর্পূরমিশ্রিত অমৃত যখন কোনও যায়গায় থাকে, যেখানে ইহা কেহ দেখিতে পায় না—তখনও ইহার সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইহার স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত লোকের লোভ জন্মে; তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের মধুর মন্দহাসি দর্শন করিলেই তাঁহার মধুর কথা শুনিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের লোভ জন্মে।

শব্দ অর্থ দুই শক্তি—শব্দ-শক্তি ও অর্থ-শক্তি, এই দুই শক্তি; শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের শব্দের শক্তি ও অর্থের শক্তি। **নানা রস**—শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস। **করে ব্যক্তি**—প্রকাশ করে। **নানা রস করে ব্যক্তি**—শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেন, তাহার প্রত্যেক শব্দের এবং প্রতি-শব্দের অর্থের এমন শক্তি আছে যে, তাহাতে নানাবিধ রসের স্ফূরণ হয়। **প্রত্যক্ষরে**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রতি অক্ষরে। **নর্ম্ম**—পরিহাস। **প্রত্যক্ষরে নর্ম্মবিভূষিত**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই নর্ম্ম-পরিহাস-পূর্ণ।

সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪২। **সে অমৃতের এক কণ**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃতের কণিকা বা অতি ক্ষুদ্র অংশ, একটী শব্দ বা একটী অক্ষর। **কর্ণ-চকোর-জীবন**—কর্ণরূপ চকোরের প্রাণ। চকোর এক রকম পাখীর নাম; চন্দ্রের সুধা (অমৃত) পান করিয়াই ইহা জীবন ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা দিয়া গোপীগণের কর্ণকে চকোরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা পান করিয়াই জীবন ধারণ করে, চন্দ্রের সুধা না পাইলে চকোরের যেমন প্রাণ রক্ষা হয় না, তদ্রূপ গোপীদিগের কর্ণরূপ চকোরও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে, তাহা না পাইলে কর্ণ-চকোরের আর প্রাণ বাঁচে না, তাহার এক কণিকা পাইলেও কর্ণচকোর জীবন ধারণ করিতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বাক্যব্যতীত, গোপীগণ আর কাহারও বাক্য শুনিতেই ইচ্ছুক নহেন, আর কাহারও বাক্য শুনিবার নিমিত্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত নহেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিতে না পাইলে তাঁহাদের কর্ণের যেন আর শ্রবণশক্তিই স্ফুরিত হয় না।

জীয়ে—জীবন ধারণ করে। **সেই আশে**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতের এক কণিকাও পাইবার আশায়।

ভাগ্যবশে—সৌভাগ্যবশতঃ। **অভাগ্যে**—দুর্ভাগ্যবশতঃ। **কভু পায়**—কখনও বা (বাক্যরূপ অমৃত) পাইয়া থাকে। **পিয়াসে**—পিপাসায়; উৎকণ্ঠায়।

গোপীদিগের কর্ণরূপ চকোর, সৌভাগ্যবশতঃ কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পায়, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও বা তাহা পায় না; যখন পায় না, তখন অমৃতের পিপাসায় কর্ণ-চকোরের প্রাণান্তক কষ্ট উপস্থিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে সময় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে পায়েন, সেই সময়েই তাঁহাদের সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; আর যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে পায়েন না, তখনই তাঁহাদের পরম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন; আর তখন শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠার আধিক্যে তাঁহাদের প্রাণান্তক কষ্ট উপস্থিত হয়।

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের মধুরতার কথা বলা হইল।

"সে শ্রীমুখভাষিত" হইতে "মরয়ে পিয়াসে" পর্য্যন্ত:—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষি অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময়-মুখের যে বাক্য, তাহার মধুরতার কথা তোমাকে আর কি বলিব? লোকে বলে, অমৃতই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বস্তু, অমৃত পান করিলে নাকি মানুষ অমর হয়; সখি! শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের মধুরতার নিকটে অমৃতের মধুরতা অতি তুচ্ছ; শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিবার নিমিত্ত বোধ হয় স্বর্গের অমৃতও লালায়িত। সখি! শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃতের তুলনা নাই—অমৃত যদি বাস্তবিক কিছুকে বলিতে হয়, তবে তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই, ইহাই পরামৃত। দেবতারা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সখি! তাঁহারা কয়দিনের জন্য অমর? পৌর্ণমাসীর নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা মানুষ অপেক্ষা বেশীদিন বাঁচেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নাকি চিরকালের জন্য অমর নহেন—দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদেরও নাকি স্বর্গ হইতে চ্যুতি ঘটে; কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত যে একবার পান করিয়াছে, তার কি আর মরণ আছে? যদি মরণ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণায় কতদিন পূর্ব্বেই তো আমাদের মৃত্যু ঘটিত? তাই মনে হয় সখি! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—মধুরতাতেই বল, আর শক্তিতেই বল, ইহা—অমৃতনিন্দি পরামৃত। শ্রীকৃষ্ণের কেবল কথারই এইরূপ প্রভাব; তার সঙ্গে তাঁহার মৃদুমধুর হাসির যখন যোগ হয়, তখন তাহার চমৎকারিতা বর্ণন করিবার ভাষা পাওয়া যায় না, সখি! শুনিয়াছি, অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে, কর্পূরের সৌগন্ধে অমৃতের লোভনীয়তা বাড়িয়া যায়, উন্মাদনা-শক্তিও নাকি বাড়ে; কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের মৃদুহাসিযুক্ত বাক্যের লোভনীয়তা ও উন্মাদনার নিকটে কর্পূর-মিশ্রিত অমৃতও পরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিম্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধরে যখন

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারীচিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমূলে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধুর মৃদুহাসির ক্ষীণ তরঙ্গ খেলিয়া যায়, তখন তাহা দেখিয়া কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীমুখের মধুর কথা শুনিবার জন্য কাহার না চিত্ত চঞ্চল হয়? আবার সেই মন্দহাসিযুক্ত বাক্য শুনিলে—ত্রিলোকীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যে নাকি উন্মত্তের মত হইয়া না যায়? লোক-ধর্ম্মে, কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া অনবরত তাঁহার বাক্যসুধা পান করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত না হয়? কেনই বা হইবেনা সখি! জগতে অপর যাহারা রসিক বলিয়া খ্যাত, নর্ম্ম-পরিহাস-পটু বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সমস্ত বাক্যটীর অর্থ গ্রহণ করিলেই তাহাদের রসিকতার বা নর্ম্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়, পৃথক্ পৃথক্ শব্দে রসিকতার বা নর্ম্ম-পটুতার পরিচয় বড় পাওয়া যায় না। কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাক্যের কথাতো দূরে, প্রত্যেক শব্দ, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরই রসিকতায় পরিপূর্ণ, নর্ম্ম-পরিহাসে সমুজ্জ্বল; তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাতে নানাবিধ রসের অভিব্যক্তিতো দেখিতে পাওয়া যায়ই, অর্থ বাদ দিয়া কেবল শব্দগুলি শুনিলেও তাহাতে নানাবিধ রসের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়—এমনি চমৎকার চমৎকার শব্দ তিনি তাঁহার বাক্যে প্রয়োগ করেন। সখি! রসগোল্লা মুখে দিলে তাহাতে যে রস আছে, তাহা তো বুঝা যায়ই, কিন্তু রসগোল্লা দেখিলেও বুঝা যায় যে তাহা রসে ভরপুর—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রতি শব্দ, প্রতি অক্ষরই তদ্রূপ রসে ভরপুর—অর্থ গ্রহণ করিলে তো তাহা বুঝা যায়ই, অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল শুনিয়া গেলেও তাহা বুঝা যায়। তবে কেন সখি তাহা শুনিয়া যুবতীগণ উন্মাদিতা না হইবে? তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্য কেন তাহারা উৎকণ্ঠিতা না হইবে? সখি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে—তাহার এক কণিকা পাইলেও এখন আমার কর্ণ কৃতার্থ হইতে পারে, সখি! চাঁদের সুধা পান করিয়াই নাকি চকোর জীবন ধারণ করে, সুধা না পাইলে চকোরের প্রাণরক্ষাই নাকি অসম্ভব হয়; সখি! আমার কর্ণের দশাও চকোরের মতনই হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃতই আমার কর্ণরূপ চকোরের একমাত্র পানীয়, ইহাই তাহার জীবন-রক্ষার মহৌষধি; এই অমৃতের এক কণিকা লাভের জন্যই কর্ণ-চকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। সৌভাগ্যবশতঃ চকোর কখনও বা চাঁদের সুধা পায়, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও বা পায় না; না পাইলে পিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়া যায়; তবুও তার একটী পরম সৌভাগ্য যে, সে কখনও কখনও চাঁদের সুধা পায়; কিন্তু সখি! আমার পরম দুর্ভাগ্য, আমি কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যসুধা পান করিতে পাইলাম না—পান করিবার উৎকণ্ঠাতেই আমার জীবন কাটিয়া গেল—আর তো উৎকণ্ঠা সহ্য হয়না সখি! আমার প্রাণ বুঝি আর তোমরা দেহে রাখিতে পারিলেনা সখি! বল সখি! আমি কি উপায় করিব? কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-মধুর বাক্য-সুধা পান করিতে পারিব?"

৪৩। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির মধুরতার কথা বলিতেছেন—শ্লোকস্থ "রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ" অংশের অর্থ করিয়া।

বেণুকলধ্বনি—বেণুর অস্ফুট মধুর শব্দ। **জগন্নারীচিত্ত**—জগতে যে সকল নারী (স্ত্রীলোক) আছে, তাহাদের সকলের চিত্ত (মন)। **আউলায়**—আলুলায়িত হইয়া যায়; শিথিল হইয়া পড়ে, বিশৃঙ্খল হইয়া যায়; গৃহকর্ম্মাদি হইতে উঠিয়া আসিয়া বেণুবাদকের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যায়।

"আউলায়"-শব্দে বেণুধ্বনির অত্যধিক মিষ্টত্ব এবং অত্যধিক কামোদ্দীপকত্ব, উভয়ই যেন ধ্বনিত হইতেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা একসঙ্গে মুখে দিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, ক্রমশঃ যেন দেহ শিথিল হইয়া যায়, আউলাইয়া যায়; ইহা অত্যধিক মিষ্টত্বেরই ফল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণের ফলও ঐরূপ। ইহা এত মিষ্ট যে, চিত্ত যেন আউলাইয়া যায়; আর, বেণুধ্বনির কামোদ্দীপনেও চিত্ত আউলাইয়া যায়।

যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি, কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়। না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ, তপ করে, তভু নাহি পায়॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ ; যে সূত্রদ্বারা ব্রজরমণীদিগের পরিধানের ঘাগরি কোমরে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা ; অন্য রমণীদিগের পক্ষে বস্ত্রগ্রন্থি। **পড়ে খসি**—খুলিয়া যায়।

কন্দর্পোদ্রেকে রমণীদিগের নীবিবন্ধ প্রায়ই শিথিল হইয়া যায় ; এস্থলে কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলে যে রমণীদিগের কন্দর্পের উদ্রেক হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। বেণুধ্বনি শুনিলে কন্দর্পের উদ্রেকে রমণীদিগের নীবিবন্ধ খসিয়া যায়।

বিনিমূলে হয় দাসী—জগতের নারীগণ বিনামূল্যে শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়া যায়। দাসীর কার্য্য সেবা ; যাঁহার সেবা করা হয়, কেবলমাত্র তাঁহার প্রীতির জন্যই সেবা ; এই সেবার প্রতিদান কিছুই যাহারা চাহে না, কিম্বা পূর্ব্বে সেব্যের নিকট হইতে কিছু পাইয়া তাহার প্রতিদানরূপেও যাহারা সেবা করে না, কেবল প্রাণের টানে সেব্য-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা যাহারা সেব্যকে সুখী করিতে চাহে, তাহারাই বিনামূল্যের (বিনা বেতনের) দাসী। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিনামূল্যের দাসী—"অশুল্কদাসিকাঃ।"

বাউলি—বাতুলী, উন্মাদিনী। **কৃষ্ণপাশে ধায়**—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতবেগে কৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া যায়।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলে রমণীগণ এতই উতালা হইয়া পড়েন যে, অন্য কোনও বিষয়েই আর তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকে না ; সমস্ত ত্যাগ করিয়া, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্তই উৎকণ্ঠায় তাঁহারা যেন উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া পড়েন ; আর স্বজন-আর্য্য-পথাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায়েন ; এই সেবার বিনিময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছুই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন না।

(রাস-রজনীতে ব্রজসুন্দরীদিগের এইরূপ অবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

৪৪। **যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী**—যে লক্ষ্মী-দেবী, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী, পতিব্রতা রমণীদিগের শিরোমণিসদৃশা। **তেঁহো**—সেই লক্ষ্মীদেবীও। **যে কাকলী শুনি**—বেণুর যে মৃদু মধুর-ধ্বনি শুনিয়া। **কৃষ্ণপাশে**—কৃষ্ণের নিকটে। **প্রত্যাশায়**—কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের আশায়।

অন্যের কথা তো দূরে, যে লক্ষ্মীঠাকুরাণী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী এবং যিনি পতিব্রতা রমণীকুলের শিরোমণি-স্বরূপা, শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া তিনিও কন্দর্পোদ্রেকে অস্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ—লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের সঙ্গ পায়েন না। **তৃষ্ণার তরঙ্গ**—কৃষ্ণসঙ্গ-লাভের নিমিত্ত যে তৃষ্ণা (বলবতী বাসনা) তাহার তরঙ্গ বা উচ্ছ্বাস। **বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ**—কৃষ্ণসঙ্গ-লাভের বাসনা করিয়াও সঙ্গ না পাওয়াতে সঙ্গ লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। **তপ করে**—কৃষ্ণসঙ্গ লাভের নিমিত্ত লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ, "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১০।১৬।৩৬ শ্লোক। **তভু**—তপস্যা করিয়াও। **নাহি পায়**—পাইলেন না।

লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" ইত্যাদি শ্রীমদ্-ভাগবতীয় (১০।৪৭।৬০) শ্লোক ইহার প্রমাণ। কারণ, যে ভাবে ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তিনি সেই ভাবে ভজন করেন নাই। ব্রজগোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া অন্য কোনওরূপ ভজনেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না ; লক্ষ্মী, গোপী-আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়াই কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। "গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ২।৮।১৮৫-৬॥" "তভু নাহি পায়" এই কথার ধ্বনি বোধ হয় এই যে, "স্বয়ং লক্ষ্মী—যিনি দেবীকুলের শিরোমণি, তিনিও যখন তপস্তা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই, তখন সামান্যা মানুষী গোয়ালিনী আমরা কোন্ গুণে তাহা পাইব ?"

"যেবা বেণুকলধ্বনি" হইতে "তভু নাহি পায়" পর্য্যন্ত ঃ—"সখি ! শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির মধুরতার কথা কি আর বলিব ? তাহার অনির্ব্বচনীয়া শক্তির কথাই বা কি বলিব ? যে নারী একবার মাত্র তাহা শুনিতে পায়, তাহারই চিত্ত যেন আউলাইয়া যায়—গৃহকর্ম্মই বল, ধর্ম্মকর্ম্মই বল, কিছুতেই আর তাহার মন বসে না ; এ কেবল দু' একজন নারীর কথা নয়, ত্রিজগতে যত রমণী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলে সকলেরই এই অবস্থা জন্মে। এই বংশীধ্বনির আর একটী কীর্ত্তির কথা আর কি বলিব ? বলিতেও লজ্জা হয়, না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছিনা। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলে সকল রমণীরই নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে—তার আর স্থানাস্থান, সময়াসময় বিচার নাই ; গুরুজনের সান্নিধ্যের অপেক্ষাও রাখে না। কন্দর্পজ্বালায় নারীকুল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের চরণে বিনামূল্যে দাসী হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে—এই উৎকণ্ঠার তাড়নায় উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া যায়। আমরা তো সামান্যা গোয়ালিনী, যে জগতে কুক্রিয়াসক্ত লোকের অভাব নাই, সেই জগতেই আমাদের বাস—তাই আমাদের কথা ছাড়িয়া দেই ; যিনি বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী, যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পতিব্রতা রমণীগণের শিরোমণি, সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও নাকি শ্রীকৃষ্ণের মধুর বেণুধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণের সঙ্গলাভের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গ না পাইয়া তাঁহার সঙ্গ-লালসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; পরে, কৃষ্ণসঙ্গ লাভের নিমিত্ত তিনি নাকি কঠোর তপস্তাও করিয়াছিলেন ; তথাপি কৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না, সখি ! লক্ষ্মী দেবীকুলের শিরোমণি ; আমরা সামান্যা মানুষী, তাতে আবার গোয়ালিনী ; লক্ষ্মীর রূপ, লক্ষ্মীর গুণ, অতুলনীয় ; আমরা রূপহীনা গুণহীনা ; সেই লক্ষ্মী তপস্তা করিয়াও যদি কৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না—আমরা কিরূপে পাইব সখি !"

৪৫। **শব্দামৃত চারি**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দরূপ অমৃত ; শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের ধ্বনি, তাঁহার নূপুর-কিঙ্কিণীর ধ্বনি, তাঁহার শ্রীমুখের কথা এবং তাঁহার বেণুধ্বনি—এই চারিটী শব্দের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। **ভাগ্য ভারি**—অত্যন্ত সৌভাগ্য। **সেই কর্ণ** ইত্যাদি—যাহার অত্যন্ত সৌভাগ্য আছে, সেই কর্ণই এই চারিটী অমৃত-মধুর শব্দ শুনিতে পায়। **কর্ণ**—কাণ। **ইহা**—এই চারিটী অমৃত-মধুর শব্দ। **যেই নাহি শুনে**—যে কাণ শুনিতে পায় না। **সে কাণ** ইত্যাদি—সেই কাণ না থাকাই ভাল ছিল ; সেই কাণ থাকার কোনও সার্থকতাই নাই ! কাণের কাজ শব্দ শুনা ; অপ্রীতিকর শব্দ শুনার জন্য কেহই কাণকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। মধুর শব্দ শ্রবণেই কাণের সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দেই শব্দ-মধুরতার পরাকাষ্ঠা ; সুতরাং এই চারিটী শব্দ যে কাণ শুনিতে পায় না, তাহার অস্তিত্বের কোনও সার্থকতাই নাই। সেই কাণ থাকা না থাকা সমান।

কাণা কড়ি—ফুটা কড়ি ; ছিদ্রযুক্ত কড়ি। আজকাল যেমন পয়সার চলন বেশী, পূর্ব্বে কড়ির এইরূপ চলন ছিল ; কড়ি দিয়াই লোকে জিনিষপত্র কিনিত ; কিন্তু যে কড়িটির মধ্যে ছিদ্র থাকিত, তাহার (সেই কাণা কড়ির) বিনিময়ে কোন জিনিষ পাওয়া যাইত না ; এইরূপ কাণা কড়ির কোনও মূল্য ছিল না—কাণা কড়ি থাকা না থাকা সমানই ছিল। তদ্রূপ, যাহার কাণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দ শুনিতে পায় না, তাহার কাণও কাণা কড়ির মতনই মূল্যহীন, ইহা থাকা না থাকা সমান।

ইহা প্রভুর বিলাপোক্তি।

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতিস্মৃতি,
নানাভাবের হইল মিলন ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৬। **ঐছে**—ঐরূপে, পূর্ব্বোক্তরূপে। **উদ্বেগ**—মনের অস্থিরতা। অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে মনের এইরূপ অস্থিরতা জন্মে। উদ্বেগে দীর্ঘ নিশ্বাস, চপলতা, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্মাদির উদয় হয়। "উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে। স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥—উঃ নীঃ পূঃ রাঃ। ১৩।" **উদ্বেগ ভাব**—উদ্বেগের ভাব। **উঠিল উদ্বেগ-ভাব**—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিলাপ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজন-চিত্তহর শব্দ-চতুষ্টয়ের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত এতই উৎকণ্ঠিত হইলেন যে, তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল (উদ্বেগ ভাব)। **মনে**—প্রভুর মনে। **কাঁহো**—কোনও। **আলম্বন**—আশ্রয়। **কাঁহো আলম্বন**—কোনও আশ্রয়। **মনে কাঁহো নাহি আলম্বন**—প্রভুর মনে কোনও রূপ আশ্রয়ই নাই; প্রভুর মন এতই অস্থির হইয়া উঠিল যে, কোনও একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিন্তাধারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। এখন এক রকম ভাব মনে আসে, মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা চলিয়া যায়, আবার আর এক রকম ভাব আসে, ইত্যাদিরূপে কোন একটী ভাবকে আশ্রয় করিয়াই মন স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কখনও বিষাদ, কখনও মতি, কখনও ধৃতি, ইত্যাদি নানাভাব একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভুর মনে উদিত হইতেছে।

আলম্বনশূন্যতা—অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্বশূন্যতা, (ভঃ রঃ সিন্ধু, পশ্চিম। ২ লহরী। ৫৭।) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিয়োগে এই অবস্থা হয়। **উদ্বেগ**—পূর্ব্ববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য। **বিষাদ**—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। "ইষ্টানবাপ্তি-প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধি-বিপত্তিতঃ। অপরাধিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥" এই বিষাদে ইষ্টপ্রাপ্তি-আদির উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে। "অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ॥"

বিষাদের সহিত রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম না; অমৃতনিন্দী তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শুনিতে পাইলাম না (ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি)। স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহারই সেবার জন্য বাহির হইলাম; কিন্তু পোড়া অদৃষ্টের গুণে, সাধ মিটাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, দু'দিন যাইতে না যাইতেই তিনি মথুরায় চলিয়া গেলেন। আবার, যখন তিনি ব্রজে ছিলেন, তখনও সাধ মিটাইয়া কোনও দিনই তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই; বামতাদি প্রতিকূলতা বাধ সাধিল; প্রাতিকূল্য দেখিয়া তিনি এ হতভাগিনীকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন (প্রারব্ধ-কার্য্যের অসিদ্ধি)। আমার দুরদৃষ্টবশতঃ আমার প্রাণবল্লভ আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন; আমি কর্ণের তৃষ্ণা মিটাইয়া তাঁহার সুমধুর নর্ম্মবাক্য শুনিতে পাইলাম না; নিঃসঙ্কোচে তাঁহার মুখকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই; তাঁহার সুকোমল বিশাল বক্ষে গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইয়া আমার বক্ষের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই; এখন এসকল কথা মনে উদিত হইয়া আমার চিত্তকে যেন বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে (শ্রীকৃষ্ণের প্রবাসরূপ বিপত্তি)। হায়! হায়! প্রাণবল্লভের চরণে আমি শত অপরাধে অপরাধিনী; তিনি যখন তাঁহার প্রেমের পসরা লইয়া আমার কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন, আমি তখন মান করিয়া বসিয়া আছি—কিছুতেই তাঁহার দিকে চাহিব না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিব না,—এইরূপ ছিল তখন আমার দৃঢ় সঙ্কল্প; কাতর ভাবে গলবস্ত্র হইয়া তিনি কত অনুনয় বিনয় করিলেন—আমি কর্ণপাতও করিলাম না; তিনি আমার সাক্ষাতে প্রণত হইলেন; "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া আমার পায়ে ধরিলেন। হতভাগিনী-আমি দৃক্‌পাতও করিলাম না। আমার প্রিয়সখীগণ আমাকে কত বুঝাইয়াছেন—আমি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদিগকে, আমার হিতার্থিনীদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। আমার এই সমস্ত স্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া এখন আমার মন যেন তুষানলে ভস্মীভূত হইতেছে (অপরাধাদি হইতে অনুতাপ)।"

এইরূপ চিন্তা করিয়াই হয়তো প্রভুর মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু উদ্বেগবশতঃ মনের স্থিরতা ছিলনা বলিয়া প্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না; তাই প্রভু ভাবিলেন (পরবর্ত্তী ৩।১৭।৪৮-৪৯ ত্রিপদী):—"হায়! হায়! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথা গেলে আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে পাইব? আমার তো মন স্থির নাই, তাই প্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধেও কিছু চিন্তা করিতে পারিতেছি না। কে আমাকে উপায় বলিয়া দিবে? আমার প্রাণপ্রিয়-সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিব? না—তারাও কিছু বলিতে পারিবে না; কৃষ্ণ-বিরহে তাদের মনও আমারই মত অস্থির। তবে আমি কি করিব? হায় হায়! কৃষ্ণ-বিহনে যে আমার প্রাণ যায়।"

মতি—বিচার-পূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণের নাম মতি। মতির্ব্বিচারোত্থমর্থ-নির্দ্ধারণম্।

ক্ষণকাল পরেই বোধ হয় প্রভুর মন একটু স্থির হইল; মন স্থির হইতেই একটু চিন্তা করার সুযোগ পাইলেন; তখনই প্রভুর মনে নির্দ্ধারণাত্মিকা-মতি নামক ভাবের উদয় হইল; প্রভু বোধ হয় ভাবিলেন—'হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তাঁহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়াইতো তাঁহার স্মৃতির নির্য্যাতনে আমাকে এত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। যদি তাঁকে ভুলিতে পারি, তাহা হইলে তো আর এ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। হাঁ, তাই করিতে হইবে। পিঙ্গলাও তো তাই করিয়াছিল—নাগর-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দিয়া বেশ সুখে কালযাপন করিতে পারিয়াছিল। আমিও তাই করিব। কৃষ্ণের সংস্পৃষ্ট কোনও কথাই আর ভাবিব না—তেমন কোনও কথাই আর কাণে তুলিব না; সখিগণকেও বলিয়া দিব, তাহারা যেন কৃষ্ণের কথা আমার কাছে আর না বলে—তাহারা যেন সর্ব্বদা অন্য কথাই বলে, যাহা শুনিয়া অন্য বিষয়ে মন দিয়া আমি কৃষ্ণকে ভুলিতে পারি। (পরবর্ত্তী ৩।১৭।৫০-৫১ ত্রিপদী দ্রষ্টব্য)।"

ঔৎসুক্য—অভীষ্টবস্তুর দর্শনের এবং প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবতী স্পৃহাবশতঃ কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতাকে ঔৎসুক্য বলে। "কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।—ভঃ রঃ সিন্ধু-দক্ষিণ ৪।৭৯॥" **ত্রাস**—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দহইতে হৃদয়ের যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। "ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্‌ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।—ভঃ রঃ সিন্ধু দক্ষিণ ৪।২৬॥" ত্রাস, শঙ্কা ও ভয়ে একটু পার্থক্য আছে। পূর্ব্বাপর-বিচারপূর্ব্বক মনে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম শঙ্কা; এই শঙ্কা যখন অত্যন্ত ঘনীভূত হয় এবং পরিমাণেও অত্যন্ত বেশী হয়, তখন তাহাকে বলে ভয়। আর ত্রাসের আবির্ভাব হঠাৎ হয়, ইহা কোনও বিচারের অপেক্ষা রাখে না। "ত্রাসোঽকস্মাদ্বিদ্যুদাদিভির্মনসঃ কম্পঃ, পূর্ব্বাপরবিচারোত্থা শঙ্কা, সৈবাতিসান্দ্রা বহুলা ভয়মিতি ত্রাস-শঙ্কা-ভয়ানাং ভেদঃ। আনন্দচন্দ্রিকা।" **ধৃতি**—পূর্ণতার জ্ঞান। দুঃখের অভাব এবং উত্তমবস্তুর প্রাপ্তিদ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহাকে ধৃতি বলে; ধৃতি থাকিলে অপ্রাপ্ত-বস্তুর নিমিত্ত কিম্বা যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কোনও বস্তুর নিমিত্ত কোনওরূপ দুঃখ হয় না। "ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ। অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥—ভঃ রঃ সিন্ধু, দক্ষিণ ৪।৭৫॥"

ধৃতি, ত্রাস ও ঔৎসুক্যের উদয়ে প্রভুর মনের অবস্থা বোধ হয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছিল। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ৩।১৭।৫২-৫৪ ত্রিপদী-অবলম্বনেই নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত হইল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতে করিতেই দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত মনকে দখল করিয়া আছেন—অমনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিত্তেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেন তাঁহার চিত্তেই শুইয়া আছেন! শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তে দেখিয়াই যেন তাঁহার সমস্ত তাপ দূর হইল, হৃদয় যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল (ধৃতি নামক ভাব)। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার এই ভাব দূর হইল। রাধাপ্রেমের স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কন্দর্পরূপেই—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিরূপেই দেখিতে পাইলেন, আরও দেখিলেন, এই অদ্ভুত কন্দর্প তাঁহার চিত্তে থাকিয়াই তাঁহাকে কন্দর্প-শরে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে; অমনি শ্রীরাধার মনে

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পঢ়ে সেই শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ না জানে সব লোক ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্রাসের সঞ্চার হইল। "যে কন্দর্প সমস্ত জগতকে নিজের শরজালে সংহার করে বলিয়া তার একটা নামও হইয়াছে 'মার', সে যখন আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার প্রতি শর-সন্ধান করিতেছে, তখন কি আর আমার নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?"—এইরূপ ভাবিয়াই তাঁহার ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইল। এই ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার, চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় রূপ-লাবণ্য, তাঁহার সুন্দর বদন এবং সুন্দর বদনে সুমধুর মন্দহাস্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের নিমিত্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। এই ঔৎসুক্য ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অন্যান্য সঞ্চারি-ভাবসমূহকে পরাজিত করিয়া নিজেই প্রভুর চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল (ভাব-শাবল্য)।

স্মৃতি—যাহা পূর্ব্বে অনুভব করা হইয়াছে, এইরূপ প্রিয় এবং প্রিয়ব্যক্তির রূপ, গুণ, বেশ প্রভৃতির চিন্তনকে স্মৃতি বলে। "অনুভূত-প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ।—উঃ নীঃ পূর্ব্বরাগ ॥ ২৩।"

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত প্রবল ঔৎসুক্যের উদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে পড়িল (স্মৃতিনামক ভাব); মনে পড়িল তাঁহার নবজলধরশ্যামরূপের কথা, তাঁহার কটিতটে শোভিত পীত বসনের কথা, তাঁহার নর্ম্মপরিহাস-পটুতা ও বৈদগ্ধ্যাদির কথা, তাঁহার রাসবিলাসের কথা।

নানাভাবের—পূর্ব্বোক্ত বিষাদাদি নানাবিধ সঞ্চারী ভাবের। **হইল মিলন**—প্রভুর মনে ঐ সমস্ত ভাবের একত্রে উদয় হইল।

৪৭। ভাব-শাবল্য—ভাব-সমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ। বহুভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হইয়া যদি প্রত্যেকেই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া নিজে প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভাব-শাবল্য হয়। ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **ভাব-শাবল্যে রাধার উক্তি**—শ্রীরাধিকার মনে যখন ভাব-সমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ (শাবল্য) উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা। **লীলাশুক**—কবি বিল্বমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণের রসলীলাবর্ণনে শ্রীবৃন্দাবনের (অথবা শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা) শুকের তুল্য নিপুণতা ছিল বলিয়াই বোধহয় শ্রীবিল্ব-মঙ্গলকে লীলাশুক বলা হয়। **হৈল—স্ফূর্ত্তি**—স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাব-শাবল্যের ফলে শ্রীরাধিকা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহারই কৃপায় লীলাশুক-শ্রীবিল্বমঙ্গলের মনে তাহার স্ফুরণ হইয়াছিল; তাই তিনি তাহা পরবর্ত্তী "কিমিহ কৃণুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। **সেই ভাবে**—ভাব-শাবল্যের বশে শ্রীরাধিকা যে ভাবে "কিমিহ কৃণুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই ভাবে (শ্রীমন্মহাপ্রভুও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া ভাব-শাবল্যের বশে ঐ "কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকটীই পড়িলেন)। **পঢ়ে সেই শ্লোক**—সেই "কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকটী পড়িলেন।

উন্মাদের সামর্থ্যে—প্রভুর দিব্যোন্মাদের প্রভাবে। **সেই শ্লোকের**—"কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকের। শ্লোকটী বিল্বমঙ্গল প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থে আছে। **না জানে সব লোক**—সকল লোকে জানে না; প্রভু জানেন; কারণ, তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট, তাই শ্রীরাধার উক্তির অর্থ তিনি জানেন; আর যাঁহারা শ্রীরাধার বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাঁহারা জানেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহই জানেন না।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভু দিব্যোন্মোদগ্রস্ত; এই দিব্যোন্মাদের আবেশে, তিনি "কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকের এরূপ গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন, যাহা সকল লোকে জানিত না। প্রভু প্রথমে শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন, তারপর শ্লোকের অর্থ করিলেন। পরবর্ত্তী "এই কৃষ্ণের বিরহে" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে প্রভুর কথিত শ্লোক-ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥ ৪ ॥

যথারাগঃ—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃতমিতি আশয়া তদাশয়া যৎকৃতং তৎকৃতমেব অন্যন্নকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তদৈব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং কামং মত্বা সবৈক্লব্যমাহ অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শক্ররয়ং মারয়তীতি কিম্। মধুরেতি মধুরাদপি মধুরস্তাসৌ স্মেরমীষদ্ধাস্য স্তদ্বিশিষ্ট আকার আকৃতির্যস্য স চেতি সঃ তস্মিন্। কৃপণা কৃপণা উৎকণ্ঠয়া অতিদীনা। লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয়। ইহ (এবিষয়ে) কিং (কি) কৃণুমঃ (করিব)? কস্য ব্রূমঃ (কাহাকেই বা বলিব)? আশয়া (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায়) কৃতং (যাহা করা হইয়াছে) কৃতং (তাহা তো করাই হইয়াছে ; আর কিছু করা নিষ্প্রয়োজন ; কারণ, তাহা বৃথা হইবে) ; অন্যাং (কৃষ্ণ কথা ব্যতীত অন্য) ধন্যাং (ধন্য—ভাল) কথাং (কথা) কথয়ত (বল) ; অহো (হায়! হায়!) হৃদয়ে (আমার হৃদয়ে) শয়ঃ (শয়ন করিয়া আছেন)! মধুর-মধুরস্মেরাকারে (মধুর-মধুর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যাঁহার আকার) মনোনয়নোৎসবে (যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক) কৃষ্ণে (সেই শ্রীকৃষ্ণে) কৃপণকৃপণা (উৎকণ্ঠানিমিত্ত অতিদীনা) তৃষ্ণা (তৃষ্ণা) চিরং বত (চিরকাল) লম্বতে (বর্দ্ধিত হইতেছে)।

অনুবাদ। আমি এখন কি করিব? কাহাকেই বা বলিব? শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশা করাও বৃথা। কৃষ্ণ-কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বল। হায়! হায়! যাঁহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, মধুর-মধুর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যাঁহার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দ-দায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকণ্ঠা-নিমিত্ত অতি দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছে। ৪

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬-৪৭ ত্রিপদীর টীকায় এই শ্লোক-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

৪৮। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু "এই কৃষ্ণের বিরহে" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে "কিমিহ কৃণুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিয়া স্বীয় চিত্তের ভাব-শাবল্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম এই ত্রিপদীতে শ্লোকস্থ "কস্য ব্রূমঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

এই কৃষ্ণের—যাঁহার অমৃতমধুর কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এই সেই কৃষ্ণের। **উদ্বেগ**—বিরহজনিত অস্থিরতা। **প্রাপ্ত্যুপায়**—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, কিরূপে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাহা। **চিন্তন না যায়**—চিন্তা করা যায় না, মন অস্থির বলিয়া। মন স্থির না থাকিলে কোনও বিষয়েই চিন্তা করা যায়না ; শ্রীকৃষ্ণবিরহে মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধেও আমি (রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভু) কোনওরূপ চিন্তা করিতে পারিতেছিনা।

প্রভু মনে করিতেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধা, তাঁহার চারিপাশে তাঁহারই প্রাণ-প্রিয় সখীগণ বিষণ্নমনে বসিয়া আছেন।

যেবা তুমি সখীগণ—তোমরা আমার যে সখীগণ এখানে আছ, (আমার দুঃখে তোমাদের যথেষ্ট সমবেদনা থাকিলেও, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় তোমাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিনা ; কারণ, তোমরাও এই উপায়-সম্বন্ধে চিন্তা

হা হা সখি ! কি করি উপায় ?॥
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ্, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ্,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥ ধ্রু ॥ ৪৯

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল মতিভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থনির্দ্ধারণ—॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে অসমর্থা।) **বিষাদে বাউল মন**—তোমাদের মনও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত বিষাদে বাউল (অস্থির, পাগলপ্রায়)। **বাউল**—বাতুল, হিতাহিত বিচারে অক্ষম। **পুছোঁ**—পুঁছি ; জিজ্ঞাসা করি।

৪৯। হা হা সখি ইত্যাদি বাক্যে শ্লোকস্থ "কিমিহ কৃণুমঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কাহাঁ করোঁ—আমি কি করিব (কৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত)। **কাহাঁ যাঙ**—কোথায় যাইব ? **কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ**– কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব ? **কৃষ্ণবিনু**—কৃষ্ণকে না পাইলে, কৃষ্ণের বিরহে।

"এই কৃষ্ণের বিরহে" হইতে "প্রাণ মোর যায়" পর্য্যন্ত—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"আমার প্রাণ-প্রিয়-সখীগণ ! কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে ; তাঁহাকে না পাইলে আর যেন প্রাণে বাঁচিনা ; কিন্তু কিরূপে যে তাঁহাকে পাইব, তাহাও আমি স্থির করিতে পারিতেছিনা ; সে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া কোনও উপায় নির্দ্ধারণের সামর্থ্যও আমার নাই ; কৃষ্ণ-বিরহে আমার মন এতই অস্থির যে, কোনও বিষয়েই আমি মন লাগাইতে পারিতেছিনা ; কোনও বিষয়েই স্থির-চিত্তে কিছু ভাবিতে পারিতেছিনা। তোমরা আমার মর্ম্মজ্ঞা সখী নিকটে আছ বটে ; আমার দুঃখে তোমরাও অত্যন্ত দুঃখিতা ; তোমাদেরও আমার সহিত যথেষ্ট সমবেদনা আছে, সন্দেহ নাই ; সর্ব্বদাই তোমরা আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া থাক ; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধে তোমরাও তো আমাকে কোনও উপদেশ দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তোমাদের অবস্থাও তো আমারই মতন—তোমাদের মনও আমার মনের মতনই অস্থির, কোনও বিষয়ে স্থির ভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম। হায় হায় ! আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব ? কার কাছে যাইব ! কে আমাকে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে পারিবে ? কৃষ্ণকে না পাইলে যে আমার প্রাণ বাঁচেনা সখি !"—এস্থলে উদ্বেগ-ভাব বা আলম্বন-শূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে। এবং অভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অভাবে বিষাদও প্রকাশ পাইতেছে।

এস্থলে উদ্বেগ ও বিষাদ এই দুইটী ভাবের সন্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। (দুই বা বহুভাব একত্র মিলিত হইলে তাহাকে ভাব-সন্ধি বলে)।

৫০। শ্লোকের "কৃতং কৃতমাশয়া" অংশের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

ক্ষণে মন স্থির হয়—অল্পক্ষণ পরেই উদ্বেগভাব চলিয়া গেল, প্রভুর মন একটু স্থির হইল। **তবে মনে বিচারয়**—মন একটু স্থির হইলে মনে মনে তিনি বিচার করিতে লাগিলেন (নিম্নোক্ত প্রকারে)। **মতিভাবোদ্গম**—মতি-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয়। মতির লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণের নাম মতি। **বলিতে হৈল** ইত্যাদি– প্রভু মনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে যাওয়াতেই তাঁহার চিত্তে আবার মতি-ভাবের উদয় হইল। ইহা গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

পিঙ্গলা—বিদেহ-নগরবাসিনী কোনও এক বারবনিতা। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে পিঙ্গলার বিবরণ দেওয়া আছে। এই বারবনিতা, কামাসক্ত পুরুষকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তম বেশভূষা করিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত। একদিন এমন হইল—তাহার নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া কত লোক আসে, কত লোক যায় ; কিন্তু কেহই তাহার ফাঁদে পড়িল না। একজন চলিয়া যায়, পিঙ্গলা মনে করে, আর একজন আসিবে, কিন্তু

দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেহই আসিল না। এইরূপে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন কোনও পুরুষকে পাইল না, তখন তাহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; সে মনে মনে ভাবিল,—"কেন আমি পুরুষের আশায় আশায় এত কষ্ট ভোগ করিতেছি? পুরুষ আমাকে কি সুখ দিতে পারে? এই অস্থি-চর্ম্ম-মল-মূত্রপূর্ণ দেহের সুখই তো সুখ নহে? তুচ্ছ পুরুষের ভজনা ত্যাগ করিয়া অন্তরে নিত্য-রমমাণ শ্রীভগবানের ভজনা করাই তো আমার শ্রেয়ঃ? না—আজ হইতে আমার অভীষ্ট পুরুষ-প্রাপ্তির দুরাশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবাই করিব—ত্যক্তা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ইহা স্থির করিয়া পিঙ্গলা নিরুদ্বেগ-চিত্তে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রাভিভূত হইল। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেনঃ—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥—আশাই পরম দুঃখ; নৈরাশ্যই পরম সুখ; কেননা, কান্ত-প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। শ্রী ভা, ১১৮।৪৪॥"

পিঙ্গলার বচন—কান্ত-প্রাপ্তির আশাত্যাগের কথা পিঙ্গলা বলিয়াছিল; কান্ত-প্রাপ্তির বৃথা আশায় কেবল উদ্বেগ এবং দুঃখই ভোগ করিতে হয়; সুতরাং কান্ত-প্রাপ্তির দুরাশা ত্যাগ করাই ভাল—ত্যক্তা দুরাশাঃ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, আশা পোষণ করিলেই পরম দুঃখ ভোগ করিতে হয়; আর আশা ত্যাগ করিলেই পরম সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি—পিঙ্গলা-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহের স্মরণ। **করাইল**—জন্মাইল। স্মৃতি ইহার কর্ত্তা; স্মৃতি করাইল। **ভাব-মতি**—মতি নামক সঞ্চারী ভাব।

পিঙ্গলার বচন……ভাবমতি—পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি প্রভুর মনে মতিভাব জন্মাইল (করাইল); পিঙ্গলার কথা মনে পড়িতেই প্রভুর মনে মতি-নামক ভাবের উদয় হইল। **তাতে**—মতি-নামক ভাবের উদয় হওয়াতে। **অর্থ-নির্দ্ধারণ**—বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিত অর্থ বাহির করা।

প্রভুর মন একটু স্থির হওয়ায়, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হইলেন; এমন সময় শ্লোকস্থ "কৃতং কৃতমাশয়া—(শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির) আশায় আশায় যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াই ফেলিয়াছি, কিন্তু আর কিছু করিব না"—এই অংশ মনে পড়াতেই পিঙ্গলার কথা মনে হইল। পিঙ্গলাও বলিয়াছিল, নাগর-প্রাপ্তির আশায় যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াই ফেলিয়াছি; কিন্তু আর তাহা করিব না—আর নাগর-প্রাপ্তির আশা করিব না, নাগরের কথাও ভাবিব না। পিঙ্গলার বচনের প্রমাণে প্রভু "কৃতং কৃতমাশয়া" অংশের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। এই অর্থ-নির্দ্ধারণে পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে তিনি যে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চিত্তস্থিত মতি-নামক-ভাবের পরিচয় দিতেছে। ইহাও গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

৫১। পিঙ্গলার কথা স্মরণ করিয়া পিঙ্গলারই মতন বিচারপূর্ব্বক প্রভু নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতেছেন।

দেখি এই উপায়ে—কৃষ্ণবিরহ-জনিত উদ্বেগ হইতে মনকে রক্ষা করার এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি। উপায়টী কি, তাহা পরে বলিতেছেন।

কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দেই। উদ্বেগ হইতে মনকে রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। নাগর-প্রাপ্তির আশায় আশায় উৎকণ্ঠার সহিত বৃথা অপেক্ষা করিয়া পিঙ্গলাও বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল; পরে নাগরের আশা ত্যাগ করায় সেও মনে শান্তি পাইয়াছিল।

আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন—আশায় আশায় বসিয়া থাকিলে মনের উৎকণ্ঠা কেবল বাড়িয়াই যায়; অভীষ্ট বস্তু না পাইলে সেই উৎকণ্ঠা বিশেষ কষ্টদায়ক হয়, আশা ছাড়িয়া দিলে আর উৎকণ্ঠাও আসিতে পারে না;

কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে—।
যারে চাহি ছাড়িতে, সে-ই শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং উৎকণ্ঠাজনিত কষ্টও মনকে ভোগ করিতে হয় না। তাই আশা ছাড়িয়া দেওয়াই সুখের কারণ হয়। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।" এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি।

"দেখি এই উপায়" হইতে "হয় বিস্মরণ" পর্য্যন্ত—পিঙ্গলার কথা মনে হইতেই প্রভু মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন—"নাগরের অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়নে পিঙ্গলাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরে, নাগরের আশা ছাড়িয়া দিয়া পিঙ্গলা মনে শান্তি পাইয়াছিল। আমার অবস্থাও কতকটা পিঙ্গলার মতনই; শ্রীকৃষ্ণের আশায় আশায় কতকাল অপেক্ষা করিলাম; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, আমার আশারও নিবৃত্তি হইল না; বরং এই বৃথা-আশায় আমার উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগই ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে যে যাতনা আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। পিঙ্গলার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আমার এই যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দেওয়া; তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেই মনে কিছু সুখ জন্মিতে পারে, অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিজনিত বিরহোদ্বেগ আর আমাকে নিপীড়িত করিতে পারিবে না; আশাত্যাগই পরম-সুখের নিদান। উঃ! যাঁহার জন্য স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কলঙ্কের ডালা মাথায় লইয়া কুলত্যাগিনী হইলাম, সেই কৃষ্ণ নাকি আজ আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছেন! না, আর না, তাঁহার আশায় আশায় যাহা করিয়াছি, করিয়াছি (কৃতং কৃতমাশয়া); আর কিছুই করিব না; এমন অকৃতজ্ঞের কোনও কথাতেই আর থাকিব না। তাই বলি সখিগণ! তোমরা আমার নিকটে আর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও কথাই বলিও না, যাহা বলিয়াছ, বলিয়াছ। আর বলিও না; উহা আর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা শুনিলেই কৃষ্ণের কথা মনে হইবে, তৎনই চারিদিক্ হইতে বিরহ-দুঃখের শত শত উত্তপ্তধারা আসিয়া আমার হৃদয়কে নিষ্পেষিত ও দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে। তোমরা অন্য কথা বল—যাতে আমার মন কৃষ্ণ হইতে অন্যদিকে ফিরিতে পারে, যাতে কৃষ্ণকে ভুলিতে পারি—এমন সব অন্য কথা তোমরা এখন আমার নিকট বল। এরূপ কথাই এখন আমার বাঞ্ছনীয়, এরূপ কথাদ্বারাই কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণা হইতে আমি অব্যাহতি পাইতে পারিব।" এই সকল বাক্যে মতি-নামক সঞ্চারী-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। "ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য" ইত্যাদি বাক্যে অমর্ষ-নামক সঞ্চারী ভাবেরও অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে (বঞ্চনা, অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ)। সম্ভবতঃ এস্থলে মতি ও অমর্ষের সন্ধি হইয়াছে।

ছাড়—ত্যাগ কর। **কৃষ্ণকথা**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা। **অধন্য**—অবাঞ্ছনীয়, দুঃখদায়ক বলিয়া। **অন্য কথা**—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা। **ধন্য**—বাঞ্ছনীয়, দুঃখদায়ক নহে বলিয়া। **যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ**—যে অন্য কথায় মনোনিবেশ হইলে কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়া যায়।

বিস্মরণ—ভুলিয়া যাওয়া।

শ্লোকস্থ "কথয়ত কথামন্যামধন্যাম্" অংশের অর্থ এই ত্রিপদী।

এই ত্রিপদীও প্রভুর উক্তি।

৫২। **কহিতেই হৈল স্মৃতি**—"ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য" ইত্যাদি কথা বলিতে বলিতেই (বলামাত্রই) রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে কৃষ্ণের স্মৃতি উদিত হইল; কৃষ্ণের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। **চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি**—কৃষ্ণের কথা স্মরণ হইতেই প্রভুর চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল, কৃষ্ণকে যেন তিনি চিত্তের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। **সখীকে কহে** ইত্যাদি—চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াই তিনি বিস্মিত হইলেন; বিস্মিত হইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া (নিম্নলিখিত ভাবে) বলিতে লাগিলেন।

রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে—যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাঁহাকে ভুলিবার জন্য প্রভু এত চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইহাই বিস্ময়ের হেতু। এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে। শ্লোকস্থ "অহো হৃদয়েশয়ঃ" অংশের অর্থ করিবার উপক্রমে এই ত্রিপদী বলিয়াছেন।

এক্ষণে শ্লোকস্থ "অহো হৃদয়েশয়ঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

যারে—যে কৃষ্ণকে। **শুঞা**—শয়ন করিয়া। **কোন রীতে**—কোনও উপায়েই।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন—"কি আশ্চর্য্য! যাঁহাকে, এমন কি যাঁহার সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই কৃষ্ণই দেখিতেছি আমার চিত্তে যেন আসন পাতিয়া শুইয়া আছেন। তাঁর অন্য স্থানে নড়িবার যেন কোনও সম্ভাবনাই দেখিতেছি না; যেন আমার চিত্তেই তিনি স্থায়ী বাসস্থান করিয়া বসিয়াছেন!! হায় হায়! আমি কি করিব? কোনও উপায়েই যে তাঁহাকে চিত্ত হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না।"

চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকার ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইয়াছে; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া ত্রাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ত্রাসের কারণ পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে।

ত্রাস জন্মিবার পূর্ব্বে বোধ হয়, দীর্ঘবিরহের পরে চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে অকস্মাৎ একটা আনন্দের ঝলক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বোধ হয় তিনি গত দুঃখ-কষ্টের কথা মুহূর্ত্তের জন্য সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কান্তের দর্শনে আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছিলেন (ধৃতি-নামক সঞ্চারিভাব)। কিন্তু এই ভাব অতি অল্প সময়ের জন্যই ছিল; এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মধ্যেই রাধাপ্রেমের স্বভাববশতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প; অমনি ত্রাস-নামক সঞ্চারিভাব তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিয়া বসিল। (পূর্ব্বে ধৃতি-ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই এ স্থলে এরূপ অনুমান করা হইল; আলোচ্য ত্রিপদী সমূহের অন্য কোনও স্থলেই ধৃতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।)

৫৩। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু কৃষ্ণকে হৃদয়ে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অপসারিত করিতে পারিলেন না। রাধাপ্রেমের স্বরূপগত অপূর্ব্ব ধর্ম্মবশতঃ হঠাৎ তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—তাহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

রাধাভাবের—শ্রীরাধার প্রেমের, মাদনাখ্য-মহাভাবের। **স্বভাব**—প্রকৃতি, স্বরূপগত ধর্ম্ম। **আন**—অন্য প্রকার; রাধাপ্রেমের প্রকৃতি অন্যান্যের প্রেমের প্রকৃতি হইতে পৃথক্; ইহাই রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি কি, তাহা বলিতেছেন। **কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান**—রাধাভাবের স্বভাব কৃষ্ণকে কাম-জ্ঞান করায়। রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ কাম (কন্দর্প) বলিয়া শ্রীরাধার মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নবীন-মদন, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস, তিনি মন্মথ-মন্মথ। ইহাতেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের চরম-বিকাশ; কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরম-বিকাশরূপ অপ্রাকৃত নবীন-মদনস্বরূপ সকলে অনুভব করিতে পারেন না—যাঁহারা পারেন, তাঁহারাও সকলে সমান ভাবে অনুভব করিতে পারেন না। ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥ ১।৪।১২৫॥" নিত্য নবায়মান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাধুর্য্য তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও, যাঁহার যতটুক প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্য মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাতেই প্রেমের চরম-বিকাশ; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থা। এ জন্যই যখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার অপ্রাকৃত নবীন-মদন বলিয়া মনে হয়; অপ্রাকৃত-নবীন-মদনস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নবীন-মদনরূপে শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই অনুভব করিতে পারেন না, ইহাতেই অপরের প্রেম অপেক্ষা রাধা-প্রেমের বৈশিষ্ট্য; এ জন্যই বলা হইয়াছে, "রাধাপ্রেমের স্বভাব আন"।

কামজ্ঞানে—কন্দর্পজ্ঞানে; শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প বলিয়া মনে হওয়ায়। **ত্রাস**—ত্রাসনামক সঞ্চারী ভাব; অকস্মাৎ মনের কম্প।

শ্রীরাধা দেখিলেন, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ কোটি মন্মথ-মদনরূপে তাঁহার চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, আর অসংখ্য শর-জালে তাঁহার (শ্রীরাধার) চিত্তকে সর্ব্বদিকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। শর (কন্দর্প-শর)-নিক্ষেপ-কার্য্যে নিরত কন্দর্পরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই ত্রাসের সঞ্চার হইল। যিনি নির্ম্মমের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিতে থাকেন, তাঁহাকে নিজের অতি সন্নিধানে হঠাৎ দর্শন করিলে কোন্ অবলা নারীরই বা ত্রাস না জন্মে? বিশেষতঃ, এই কন্দর্প সমস্ত জগৎকেই নিজের শরে বিদ্ধ করিয়া সংহার করিয়া থাকেন—তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কন্দর্পের একটী নাম "মার"। নিজের শরজালে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত জগৎকে মারে (সংহার করে) বলিয়া কন্দর্পের নাম "মার" হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প মনে করিয়া, তাঁহার "মার"-নামের কথা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উদিত হইল—তাতেই তাঁহার ত্রাস আরও বৃদ্ধি পাইল; "যে সমস্ত জগৎকেই সংহার করে (মারে), সে কি আমাকে রক্ষা করিবে?"—ইহাই প্রভুর মনের ভাব, ইহাই ত্রাসের কারণ।

কহে—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন। এই "কহে" শব্দটী গ্রন্থকারের উক্তি। **যে জগত মারে**—যে কন্দর্প জগৎকে (জগদ্বাসীকে) মারে (সংহার করে), শরবিদ্ধ করিয়া)। **সে পশিল অন্তরে**—সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। দূরে থাকিয়াই যাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, সে যদি একেবারে হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে আর পরিত্রাণের উপায় কি আছে—ইহাই ধ্বনি। **এই বৈরী**—এই শত্রু। শত্রুর ন্যায় বাণবিদ্ধ করে বলিয়া কন্দর্পকে শত্রু বলা হইল। কৃষ্ণপক্ষে অর্থ এইরূপঃ—শ্রীকৃষ্ণ আমার সহিত শত্রুর মতনই ব্যবহার করিতেছেন; আমাদিগকে অনাথিনী করিয়া তিনি মথুরায় যাইয়া আমাদিগকে তাঁহার বিরহানলে দগ্ধীভূত করিতেছেন, ইহা শত্রুর কাজই; মিত্রের কাজ নহে—কোনও মিত্র এমনভাবে কাহাকেও কষ্ট দেয় না। আবার, তাঁহার স্মৃতির নির্য্যাতন হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যখনই আমরা তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলাম, ঠিক তখনই তিনি আসিয়া চিত্ত দখল করিয়া বসিলেন—চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহার কন্দর্পতুল্য-রূপ দেখাইয়া কন্দর্পজ্বালায় আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতে আরম্ভ করিলেন—ইহাও শত্রুর কাজই। বুঝা যাইতেছে, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে দুঃখ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য—তাই যখন তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার স্মৃতির নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলাম, তখনও হঠাৎ আসিয়া তিনি বাধ সাধিলেন—তাঁহাকে ভুলিতে দিলেন না; যে হৃদয়ে শুইয়া থাকে, তাহাকে কিরূপে ভুলা যায়? তাই মনে হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শত্রুই—বন্ধু নহেন।

না দেয় পাসরিতে—ভুলিতে দেয় না; হৃদয়ে শুইয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে ভুলিতেও পারি না।

"যে জগতে মারে" হইতে প্রভুর উক্তি। এস্থলে ত্রাসের হেতু দেখাইতেছেন।

৫৪। **ঔৎসুক্য**-ঔৎসুক্য নামক সঞ্চারীভাব। **প্রাবীণ্য**—প্রাধান্য, প্রবলতা, বলবত্তা। "প্রাবীণ্যে" স্থলে "প্রাধান্যে" পাঠান্তরও আছে। **ঔৎসুক্যের প্রবীণ্যে**—ঔৎসুক্যের প্রবলতায়। ইহা "উদয় কৈল" ক্রিয়ার কর্ত্তা। **জিতি**—জয় করিয়া, পরাভূত করিয়া। **অন্য ভাবসৈন্য**—উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রভৃতি সঞ্চারীভাব

ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্যে,
উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভৎর্সনে—॥ ৫৪

মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায়॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রূপ সৈন্যগণকে। **উদয় কৈল**—উদয় করিল; স্থাপন করিল। **নিজরাজ্য**—ঔৎসুক্যের রাজ্য; ঔৎসুক্যের প্রভাব। **মনে**—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে।

এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি; ইহার অন্বয় এইরূপ:—অন্য ভাব-সৈন্যকে জয় করিয়া ঔৎসুক্যের প্রবীণ্য প্রভুর মনে নিজরাজ্য উদয় করিল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে, উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রভৃতি নানাবিধ সঞ্চারীভাবের উদয় হইয়াছিল; এক্ষণে নিজের চিত্তে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত আবার প্রবল ঔৎসুক্যের উদয় হইল; এই উৎকণ্ঠা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে, ক্ষণকাল-বিলম্বও যেন আর সহ্য হয় না। এই ঔৎসুক্য-ভাব প্রবলতা ধারণ করিয়া উদ্বেগ-বিষাদাদি অন্যান্য ভাবকে পরাজিত করিয়া প্রভুর মনে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসিল (ভাব-শাবল্য)। এক্ষণে প্রভুর মনে অন্য কোনও ভাব নাই, একমাত্র ঔৎসুক্যই সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে।

ঔৎসুক্যকে দেখিয়াই অন্যান্য ভাবসমূহ পলাইয়া যায় নাই; তাহারাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টাকে যুদ্ধের সঙ্গে এবং তাহাদিগকে যুদ্ধরত সৈন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া সর্ব্বাধিক-শক্তিমত্তাবশতঃ ঔৎসুক্যকে বিজয়ী রাজার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

স্থূলকথা এই যে, প্রভুর মনে যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল, তখনও, কখনও উদ্বেগ, কখনও বিষাদ, কখনও মতি, আবার কখনও বা ত্রাস আসিয়া মনে উদিত হইত; কিন্তু ঔৎসুক্য প্রাধান্য লাভ করায় অন্য সমস্ত ভাব অন্তর্হিত হইল, কেবল ঔৎসুক্যমাত্র হৃদয়ে থাকিয়া গেল। ইহা ভাবশাবল্যের দৃষ্টান্ত।

মনে—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে। **লালস**—লালসা; শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত বলবতী বাসনা। **না হয় আপন বশ**—মন (রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর) নিজের বশীভূত হয় না। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু চাহেন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে; কিন্তু তাঁহার মন চাহে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ করিতে। তাই প্রভুর মন প্রভুর বশীভূত নহে, অবাধ্য হইয়া উঠিল। **দুঃখে**—নিজের মন নিজের বশীভূত নহে বলিয়া দুঃখবশতঃ। **মনে করেন ভৎর্সন**—প্রভু নিজের মনকে (অবাধ্য বলিয়া) ভৎর্সনা (তিরস্কার) করিলেন।

প্রভু নিজের মনকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এই ত্রিপদীও গ্রন্থকারের উক্তি।

৫৫। এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি। এই ত্রিপদীতে প্রভু মনকে তিরস্কার করিতেছেন।

বাম—প্রতিকূল। **দীন**—দরিদ্র; কৃষ্ণধনে বঞ্চিত বলিয়া দুঃখিত। **জল বিনু যেন মীন**—জল না পাইলে মৎস্যের (মীনের) যে অবস্থা হয়, কৃষ্ণকে না পাইয়া মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। **মীন**—মৎস্য। **কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়**—জল না পাইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই যেমন মৎস্য মরিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে আমার মনও যেন তদ্রূপ অল্পক্ষণের মধ্যেই মরিয়া যাইবে।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন—"আমার মন, আমার কথা মানেনা—সে আমার প্রতিকূল আচরণ করিতেছে (বাম)! তাহার অবস্থা দেখিতেছি নিতান্ত শোচনীয় (দীন)! যেন জলহীন

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মীনের মতন! জল ছাড়া হইয়া মীন যেমন এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, কৃষ্ণ ছাড়া হইয়া আমার মনও যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারেনা! তাই সে আমার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। আমি চাই কৃষ্ণকে ভুলিতে, আর আমার মন চায় কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে—যে কৃষ্ণ এত রকমে আমাকে এত কষ্ট দিতেছেন, সেই কৃষ্ণের সঙ্গের নিমিত্ত আমার মনের বলবতী লালসা! ধিক্ আমার মনকে।"

"মধুর-মধুর-স্মেরাকারে" ইত্যাদি অবশিষ্টাংশের অর্থ করিতেছেন।

মধুর হাস্য বদনে—শ্রীকৃষ্ণের বদনে যে মধুর হাস্য, তাহা। **মনোনেত্র-রসায়নে**—(যেই মধুর হাস্য) মন ও নয়নের তৃপ্তিদায়ক; যে হাস্য দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মনের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়, হৃদয়ে অপরিসীম শান্তি উথলিয়া উঠে। **কৃষ্ণ-তৃষ্ণা**—কৃষ্ণকে পাওয়ার নিমিত্ত লালসা। **দ্বিগুণ বাড়ায়**—দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত করে (হাস্য)।

এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি; ইহার অন্বয় এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণবদনের মনোনেত্র-রসায়ন মধুর হাস্য কৃষ্ণ-তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেয়।

প্রভু নিজের মনকে ধিক্কার দিয়া একবার বোধ হয় ভাবিলেন—কৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত মন এত উতালা হইল কেন? প্রভু তখনই বোধ হয়, চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের দিকেও একবার চাহিলেন, চাহিয়াই যেন অবাক্ হইয়া গেলেন—এত সুন্দর! তাই প্রভু মুখ ফুটাইয়া বলিলেন—"না, মনকে কেন বৃথা তিরস্কার করিতেছি? অমন সুন্দর মুখখানা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য যে লালসা জন্মে, তাহা দমন করিবার শক্তি তো মনের নাই—মনের কেন, বোধ হয় কাহারও এমন শক্তি নাই। অহো! শ্রীকৃষ্ণের কি সুন্দর মুখ! সেই সুন্দর মুখে আবার কি সুন্দর মধুর মন্দ-হাসি! দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়, মনের তাপ-গ্লানি সমস্তই নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যায়; ঐ সুন্দর মধুর হাসিটুকু যেন মনে, নয়নে,—সর্ব্বাঙ্গে একটা মাদকতা-মিশ্রিত স্নিগ্ধতার ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়। যে ইহা দেখিবে, কৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত তাহার লালসা আপনা-আপনিই শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। কার সাধ্য, তখন আর তাঁহাকে ত্যাগ করার কথা মনে স্থান দিতে পারে?"

৫৬। শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসির মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মিল; কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া বিষাদের সহিত আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন" ইত্যাদি।

প্রাণধন—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ধন। নিজের ধন সকলেই যত্ন করিয়া রক্ষা করে; কারণ, ধনের দ্বারাই লোকের অভীষ্টবস্তু সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং ধনই সাধারণ লোকের প্রিয় বস্তু। আবার, ধন রক্ষা করিতে যত যত্নের প্রয়োজন, তদপেক্ষাও অধিক যত্নের সহিত লোক প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেও লোক কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, প্রাণই সুখভোগের একমাত্র উপায়। সুতরাং ধন অপেক্ষাও প্রাণ অধিক প্রিয়। কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার নিকট নিজের প্রাণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তিনি নিজের প্রাণ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; প্রাণ তো দূরের কথা, যে আর্য্যপথ রক্ষার নিমিত্ত কুলবতী রমণীগণ অম্লানবদনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সেই আর্য্যপথও অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সমস্তই "প্রাণধন" শব্দের ধ্বনি।

পদ্মলোচন—পদ্মের ন্যায় লোচন (নয়ন) যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন পদ্মের দলের ন্যায় দীর্ঘ, আকর্ণ-বিস্তৃত এবং অরুণাভ। পদ্মের সঙ্গে তুলিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-নয়নের স্নিগ্ধতা, সন্তাপহারিতা এবং শুচিতাও সূচিত হইতেছে।

কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল লৈয়া ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"পদ্মলোচন"-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"হে শ্রীকৃষ্ণ! হে পদ্মলোচন! তোমার আকর্ণ-বিস্তৃত অরুণিম নয়ন-যুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কবে আমি আমার নয়নের জ্বালা জুড়াইব? তুমিই বা তোমার প্রেম-মধুর দৃষ্টি-সুধা দ্বারা কবে আমার হৃদয়ের জালা জুড়াইবে? আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিবে?"

দিব্য সদ্গুণ-সাগর—দিব্য সদ্গুণের সাগর-তুল্য যিনি। সাগরের জল যেমন অপরিমিত, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-সদ্গুণও তেমনি অপরিমিত, অনন্ত। দিব্ ধাতু হইতে দিব্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, লীলা। দিব্যশব্দের অর্থ লীলা-বিলাসোচিত। শ্রীকৃষ্ণ বৈদগ্ধ্যাদি অনন্ত লীলাবিলাসোচিত গুণের আধার।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া অর্থ করিলে, দিব্য শব্দের অর্থ চিন্ময়, অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত গুণ নাই বটে, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার তিনি।

দিব্যসদ্গুণ-সাগর-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"হে শ্রীকৃষ্ণ! নর্ম্ম-পরিহাস-পটুতাদি অনন্ত মধুর গুণের আধার তুমি। তোমার নর্ম্ম-পরিহাসে, তোমার লীলাবৈদগ্ধ্যাদিতে কবে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অমৃতাভিষিক্ত হইবে? তোমার বিলাস-বৈচিত্রীতে কবে তুমি আবার আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিবে?"

শ্যামসুন্দর—মনোরম নবঘন-শ্যাম বর্ণ যাঁহার। শৃঙ্গার-রসের নামও শ্যামরস; এই অর্থে শ্যাম-শব্দে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারকে, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিকেও বুঝাইতে পারে। এই শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—হে কৃষ্ণ! তোমার দলিতাঞ্জন-চিক্কণ নবঘন-শ্যাম রূপের দর্শন আমার ভাগ্যে কবে হইবে? কবে আমি তোমার শৃঙ্গার-রস-রাজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন-মনের তৃষ্ণা জুড়াইতে পারিব!

পীতাম্বরধর—পীতবর্ণ (হল্‌দে বর্ণ) বস্ত্র (অম্বর) ধারণ করেন, যিনি। এই শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:-"হে কৃষ্ণ! তোমার নবঘন-শ্যাম তনুতে তুমি যখন পীত বসন ধারণ কর, তখন মনে হয় যেন নবীন মেঘে স্থির বিজুরী ক্রীড়া করিতেছে; তোমার সেই মোহনরূপ আমি কবে দর্শন করিব?" আরও নিগূঢ় ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—"হে কৃষ্ণ! হে আমার প্রাণবল্লভ! তোমার পীত বসনের বর্ণের ন্যায় আমার এই গৌর অঙ্গ দ্বারা কবে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার নবঘন-শ্যাম তনুকে আবৃত করিয়া রাখিব? কবে তোমার কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্যাম-অঙ্গে আমার অঙ্গ মিশাইয়া অঙ্গের বিরহ-তাপ দূর করিব?"

রাসবিলাস নাগর—রাসে বিলাস করেন যে নাগর (কান্ত)। ধ্বনি:—হে আমার প্রাণকান্ত! হে নাগর-শিরোমণি! আবার কবে আমি তোমার হাতে হাত রাখিয়া রাসস্থলীতে নৃত্য করিব? আবার কবে তুমি তাল ধরিবে, তোমার তালে তালে আমি নৃত্য করিব; এবং আমি তাল ধরিব, আমার তালে তালে তুমি নৃত্য করিবে? আবার কবে সমস্ত সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তুমি রাস-লীলা করিবে?

৫৭। **কাহাঁ গেলে**—হে নাগর! তোমার বিরহ-যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; কি উপায়ে যে তোমাকে পাইব, স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করার শক্তি আমার নাই। হে আমার হৃদয়েশ্বর? দয়া করিয়া তুমি বলিয়া দাও, কোথায় গেলে তোমায় পাইব? তুমি বলিয়া দাও, নাথ! আমি তোমার উপদেশমত তোমাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেই স্থানেই যাইব।

এত কহি চলিল ধাইয়া—পূর্ব্বোক্তরূপ বলিয়াই প্রভু উঠিয়া দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিলেন, যেন কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত, অথবা যে স্থানে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে যাওয়ার নিমিত্তই দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিলেন। "এত কহি" ইত্যাদি বাক্য গ্রন্থকারের উক্তি।

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৫৮
এইমত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদচেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে ॥ ৫৯
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্রমুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬০
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ?।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ৬১
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভু ধাইয়া চলিতেই স্বরূপ-দামোদর উঠিয়া প্রভুকে ধরিয়া কোলে করিয়া আনিলেন এবং প্রভুর নিজের বসিবার যায়গায় বসাইয়া দিলেন।

৫৮। অল্পক্ষণ পরেই প্রভু বাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইলেন, রাধা-ভাবের আবেশ প্রচ্ছন্ন হইল। তখন কোনও মধুর গান কীর্ত্তন করার নিমিত্ত প্রভু স্বরূপকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে স্বরূপ-দামোদর বিদ্যাপতির পদাবলী এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করিলেন; শুনিয়া প্রভুর যেন কাণ জুড়াইয়া গেল।

"গীত গোবিন্দ" স্থলে "রায়ের নাটক" পাঠান্তরও আছে। রায়ের নাটক—রামানন্দরায়-রচিত জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক।

৫৮। **উন্মাদচেষ্টিত**—দিব্যোন্মাদের চেষ্টা (কায়িক অভিব্যক্তি)।

প্রলাপবচন—দিব্যোন্মাদের বাচনিক অভিব্যক্তি; চিত্রজল্পাদি।

৬০। **সহস্রমুখে**—সহস্র মুখ যাঁহার তিনি; শ্রীঅনন্তদেব। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এক এক দিনে মহাভাবের যে সমস্ত বিকার প্রকট করেন, স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া সহস্রমুখে বর্ণনা করিয়াও তাহা শেষ করিতে পারেন না।

৬১। অনন্তদেব ঐশ্বরিক শক্তিতে সহস্রমুখে যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সাধারণ জীব একমুখে তাহা কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? তাই আমি (গ্রন্থকার) সেই লীলার সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র দেখাইলাম।

শাখাচন্দ্রন্যায়- বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পত্রাদির ভিতর দিয়া যখন চন্দ্র দেখা যায়, তখন সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখা যায়না; পত্রাদির ফাঁকে ফাঁকে অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশ দেখিয়াও, চন্দ্র কোন্ দিকে আছে, তাহা বলা যায় এবং চন্দ্রের স্বরূপ কি তাহারও কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। তদ্রূপ, কোনও বিষয়ের সম্যক্ বর্ণনা দিতে অক্ষম হইয়া যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেন, তাহা হইলে ঐ আভাস হইতেই অনুভবশীল পাঠক, বর্ণনীয় বিষয়টীর কিঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইতে পারেন। ইহাকেই শাখাচন্দ্রন্যায়-দিগ্‌দর্শন দেওয়া বলে।

৬২। **ইহা**- শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-সম্বন্ধীয় ভাব-বিকার।

অলৌকিক—যাহা লৌকিক-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহা অপ্রাকৃত। **গূঢ়**—গোপনীয়; সর্ব্বসাধারণের অবিদিত। **চেষ্টা-জ্ঞান**--চেষ্টা সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্য্যাদি সম্বন্ধে ধারণা।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তাহা যিনি শুনিবেন, তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা দূর হইবে এবং অলৌকিক রাধাপ্রেমের কিরূপ প্রভাব ও ঐ প্রেমের প্রভাবে দেহে ও মনে কিরূপ বিকারাদির অভিব্যক্তি হয়, সেই সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু ধারণা জন্মিবে।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥ ৬৩

অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৩। **মাধুর্য্য-মহিমা**—মাধুর্য্য এবং মহিমা; অথবা মাধুর্য্যের মহিমা। যে রাধা-প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, তাহার কি আর তুলনা আছে? এই প্রেমের মাধুর্য্যে অন্য সমস্ত মধুর বস্তুকে ভুলাইয়া দেয়, নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দেয় এবং ইহার এমনি প্রভাব যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই প্রেমের সম্যক্ বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

রাধা-প্রেমের আরও একটী অদ্ভুত মহিমা এই যে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও ইহার বিক্রম সহ্য করিতে পারেন না; তাই গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াও এই রাধাপ্রেমের বিক্রমে কখনও বা কূর্ম্মাকার হইয়া গিয়াছিলেন, আবার কখনও বা তাঁহার অস্থিগ্রন্থি বিতস্তি-পরিমাণ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই এই প্রেমের বিক্রম সহ্য করিতে পারেন না; ইহাই এই প্রেমের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা জীবকে দেখাইয়া গেলেন।

সীমা—মাধুর্য্য-মহিমার সীমা (অবধি)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক এই অলৌকিক প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন এবং আনুষঙ্গিক-ভাবে সকলকেই এই প্রেমের মহিমার চরম অবধি দেখাইলেন।

৬৪। **বদান্য**—দাতা। **ঐছে**—ঐরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত দয়ালু, তাঁহার মত দাতা প্রাকৃত লোকের মধ্যে থাকা তো সম্ভবই নয়, ভগবদবতারদের মধ্যেও নাই। জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি জীবকে যাহা দিয়া গেলেন, নিজের সেই অনর্পিতচরী ভক্তিসম্পত্তি ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও ভগবৎস্বরূপই দেন নাই—এমন কি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনও দেন নাই। শ্রীরাধার প্রেম যে কি অদ্ভুত বস্তু, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সম্যক্ জানিতেন না; সুতরাং ইহা যে কেহ কখনও জানাইবে, এমন কল্পনাও কেহ কখনও করিতে পারে নাই; কিন্তু পরম-কৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই অতি নিগূঢ় প্রেমের মহিমা—জীবকে যে কেবল জানাইয়া দিলেন তাহা নহে, নিজে তাহা আস্বাদন করিয়া, নিজের দেহে তাহার অপূর্ব্ব বিকারাদি দেখাইয়া দিয়াও সকলকে বিস্মিত করিলেন। কেবল ইহাই নহে; কিরূপে সেই প্রেমের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া জীব অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে, তাহাও তিনি জীবকে জানাইয়া গেলেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের একটা উজ্জ্বলতম আদর্শও রাখিয়া গেলেন। তাই বলা হইয়াছে, তাঁহার দয়া অদ্ভুত, তাঁহার বদান্যতাও অদ্ভুত।

গৌরের করুণার ও বদান্যতার অসাধারণত্ব

জগতে রাগমার্গের ভক্তির প্রচার ছিল শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের একটী উদ্দেশ্য। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি বাক্যে এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সূত্রাকারে রাগমার্গের ভজনের উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার করুণা, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহাতে তাঁহার বদান্যতাও প্রকাশ পাইয়াছে; যেহেতু, ঐভাবে যাঁহারা তাঁহার ভজন করিবেন, তাঁহারা যে তাঁহাকেই পাইবেন—তাহাও তিনি অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"মামেবৈষ্যসি।" নিজেকে পর্য্যন্ত যিনি দান করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহাকেই পাওয়ার উপায়ও যিনি বলিয়া দেন, তিনি বদান্য-শিরোমণি, একথা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহাকে পাওয়া যে পরম-লোভনীয় বস্তু, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। যে বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা তিনি প্রকাশ করিলেন, তাহা যে পরম-লোভনীয়, তাহা না জানাইলে লোক ভজনে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কিন্তু সেই লোভনীয় বস্তুটী কি? সেই আনন্দঘন, রসঘন-বিগ্রহ, সেই অশেষ-রসামৃত-বারিধির সহিত একান্ত আপন-জনভাবে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রসের সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া, সেই সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ মধ্যে তাঁহারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, বাহুতে বাহু জড়াইয়া, তাঁহার সহিত তন্ময়ভাবে খেলা করা—ইহাই লোভের বস্তু। ব্রজে তিনি সেই ভাবে তাঁহার পরিকর ভক্তদের সহিত মনোহারিণী খেলা খেলিয়াছেন ; সেই খেলা খেলিয়াছেন অবশ্য নিভৃতে, গভীর নিশিথে, নির্জ্জন বনের মধ্যে। যাঁহাদের সহিত তিনি এই খেলা খেলিয়াছেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ ব্যতীত এবং তিনি নিজে ব্যতীত এই খেলা অপর কেহ দেখে নাই। পরম-লোভের বস্তুটী অপর কাহাকেও দেখাইয়া যান নাই ; তবে ব্যাসরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং পরীক্ষিত মহারাজের সভায় সশিষ্য মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদের সমক্ষে শ্রীশুকদেবের মুখে তাহা প্রচার করাইয়া জগদ্‌বাসী সকলে যাহাতে তাহা শুনিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন ; যেন এই লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিয়া তাহাতে প্রলুব্ধ লইয়া প্রাপ্তির নিমিত্ত লোক "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" তন্মনা, তদ্‌ভক্ত এবং তদ্‌যাজী হইতে পারে। লোভের বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণ দেখান নাই, কেবল তাহার কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া গিয়াছেন ; সেই উপায়ের আদর্শও স্থাপন করেন নাই। তথাপি লোভের বস্তুটীর কথা শুনাইয়া যাওয়া এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়ের কথা বলিয়া যাওয়াও তাঁহার অপার করুণা ও বদান্যতার পরিচায়ক।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐ অপার করুণার এবং অপার বদান্যতার চরমতম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে প্রেমলাভ হইলে সেই অশেষ-রসামৃত-বারিধির সহিত রসসমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইতে রসময়ী খেলা সম্ভব হইতে পারে, ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে তিনি সেই প্রেম-প্রাপ্তির উপায়টীর কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন, সেই প্রেম-সম্পত্তিটী দেন নাই ; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রেম-সম্পত্তিটীই তিনি আপামর-সাধারণকে দিয়া গিয়াছেন। যত দিন তাঁহার লীলা প্রকটিত ছিল, তত দিন এই ভাবেই প্রেম-প্রাপ্তির সৌভাগ্য সকলে লাভ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা গৌরস্বরূপের কৃপার এবং বদান্যতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যাহাতে সেই শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী-শক্তিসম্পন্ন অপূর্ব্ব প্রেমলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন, নিজের উপদেশের দ্বারা এবং তাঁহার চরণানুগত গোস্বামিপাদদিগের দ্বারা ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করাইয়া তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, নিজে আচরণ করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদবর্গের দ্বারা আচরণ করাইয়াও ভজনের আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি যাহা করেন নাই। ইহা তাঁহার কৃপার ও বদান্যতার আর এক বৈশিষ্ট্য।

যে লোভনীয় বস্তুর কথা শুনাইবার ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি করিয়া গিয়াছেন, সেই লোভনীয় বস্তুটী হইল বাস্তবিক—প্রেম, শুদ্ধপ্রেম। সেই প্রেম যে কত মধুর, তাহার প্রভাব যে কিরূপ অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয়—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তাহা তিনি পরিদৃশ্যমান্ ভাবে জগতের জীবকে দেখান নাই। গৌরস্বরূপে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার লীলাতে আনুষঙ্গিক ভাবে।

প্রেম-বস্তুটী চক্ষুর্দ্বারা দেখিবার জিনিস নহে ; হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলে বাহিরে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হয় ; এই অশ্রু-কম্পাদি দ্বারাই হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব, মধুরত্ব ও প্রভাবের কথা জানা যায় ; দেহের উত্তাপাদিদ্বারা যেমন জ্বরের অস্তিত্বের এবং প্রভাবের কথা জানা যায়, তদ্রূপ। প্রেম স্বতঃই পরম-মধুর, "রতিরানন্দ-রূপৈব" ; যেহেতু, ইহা হ্লাদিনীর বৃত্তি। এই প্রেম যত গাঢ় হয়, তাহার মধুরত্বও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার প্রভাবও ততই তীব্র হইয়া উঠে—তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় অশ্রু-কম্পাদির প্রকৃতিদ্বারা। প্রভুর চিত্তে প্রেম যখন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, তখন তাঁহার অশ্রু-কম্পাদি সুদ্দীপ্ত—সুষ্ঠুরূপে উজ্জ্বল—হইয়া উঠিত ; পিচ্‌কারীর ধারার ন্যায় নয়নে ধারা প্রবাহিত হইত ; সেই অবস্থায় যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার অশ্রুধারায় চারিদিকের লোকগণ এমনই সিক্ত হইতেন যে, দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন ডুব দিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছেন।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুলকের উদ্‌গমে রোমকূপসমূহ শিমুলের কাঁটা বা বড় বড় ব্রণের মত হইয়া উঠিত, তাহাতে আবার রক্তোদ্‌গমও হইত। বৈবর্ণ্যে প্রভুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কখনও বা মল্লিকা ফুলের মত সাদা, আবার কখনও বা জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত। কম্পে প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র বেতসীলতার ন্যায় প্রভুর দেহ কম্পিত হইত, তখন দন্ত সকল খট্ খট্ শব্দ করিয়া উঠিত। তিনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি থাকিত না। কখনও বা প্রেমানন্দের আস্বাদনজনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া যেন সম্বিৎহারা হইয়া থাকিতেন। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন।" প্রেমোদ্‌ভূত নানাবিধ ভাব এক সঙ্গে উদিত হইয়া প্রভুর দেহকে যেন সম্যক্‌রূপে বিমর্দ্দিত করিত; আবার কখনও বা প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-গ্রন্থি শিথিল করিয়া দেহকে অস্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধিত করিত, কখনও বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দেহের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া প্রভুকে কূর্ম্মাকৃতি করিয়া দিত। প্রেমের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত উন্মাদনা এ-সমস্ত ভাবেই প্রভুর দেহে প্রকটিত হইয়াছে—গোপনে নহে—বহুলোকের সাক্ষাতে। তাহাতেই প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা লোক যেন সাক্ষাদ্‌ভাবেই জানিতে পারিয়াছে; প্রেমকে যেন পরিদৃশ্যমান্‌ভাবে দেখিতে পাইয়াছে, তাহার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। প্রভু এই ভাবেই প্রেমরূপ লোভনীয় বস্তুটীকে সাধারণের নয়নের গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এতাদৃশ মাধুর্য্যময় এবং প্রভাবশালী প্রেম হইল আরও একটী পরম লোভনীয় বস্তুর আস্বাদনের উপায় মাত্র। সেই পরম লোভনীয় বস্তুটী হইতেছে—রসিকেন্দ্র শিরোমণি মদনমোহনের মাধুর্য্য, যাহা "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" এবং যাহা "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর।" শ্রীকৃষ্ণের এই মদন-মোহনরূপ দর্শনের সৌভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকট দ্বাপর-লীলাতেও সাধারণকে দান করেন নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া সেই মদন-মোহনরূপ অপেক্ষাও সর্ব্বাতিশায়িরূপে আনন্দজনক এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় রূপ রায়রামানন্দাদির নিকটে প্রকটিত করিয়াছেন—যাহার মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া রায় রামানন্দ—মদন-মোহনরূপ দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা যিনি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই রায় রামানন্দও—আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরম-করুণ প্রভু এই রূপটীর কথা কেবল শুনাইয়াই যায়েন নাই, পরিদৃশ্যমান ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপের করুণার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার; এই মাধুর্য্যের সম্যক্ বিকাশ হইতেছে—রসস্বরূপ পরম-ব্রহ্মের, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে; কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন্ আবির্ভাবে, তাহা পূর্ব্বে কেহ বিশেষ জানিত না; স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও স্ফুটরূপে তাহা বলেন নাই। প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহেই এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, না কি আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহেই চরমতম বিকাশ, তাহা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট কথায় কোথাও বলেন নাই। শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দররূপেই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং দেখাইয়াও গিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেন প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহ; তাঁহার মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ হইতেছে তাঁহার মদনমোহন রূপে। আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি হইতেছেন প্রেমের আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহ; এই আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহের মাধুর্য্য, "রসরাজ-মহাভাব দু'য়ে-একরূপের" মাধুর্য্য—যে মদনমোহনরূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময়, অধিকতর আনন্দোন্মাদনাময়, গোদাবরী-তীরে শ্রীল রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু তাহা জানাইয়াছেন। যশোদা-নন্দন অপেক্ষা শচীনন্দনের কৃপার ইহাও একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

আবার, অর্জ্জুনের নিকটে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য", "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন, এইরূপ করিলে "মামেব এষ্যসি—আমাকেই পাইবে।" কিন্তু এই তাঁহাকে পাওয়ার গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা তিনি তখন খুলিয়া বলেন নাই; হয়তো বা ইহা "সর্ব্বগুহ্যতম বস্তু" বলিয়াই, অথবা অর্জ্জুন দ্বারকা-পরিকর বলিয়া তাঁহার ভাব ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত বলিয়াই "আমাকেই পাইবে" বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম তাঁহার নিকটে স্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত

সর্ব্বভাবে ভজ লোক ! চৈতন্যচরণ ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৫
এই ত কহিল কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৬৬
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস ।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন নাই। পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-প্রধান-আবির্ভাব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময় এবং অধিকতর মাধুর্য্যময় স্বীয় স্বরূপটী প্রকাশ করিয়া ভঙ্গীতে তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ভঙ্গীতে তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া ভঙ্গীতে ইহাও জানাইলেন—অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশিত "মামবৈষ্যসি"-বাক্যের গূঢ় রহস্য হইতেছে এই যে, আমার বিষয়-প্রধান-বিগ্রহের এবং আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহের, এই উভয়-আবির্ভাবের মাধুর্য্যের আস্বাদনই পাইবে। তাই শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" এই উভয়-স্বরূপের মাধুর্য্যের যুগপৎ আস্বাদনেরও যে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীশ্রীমদন-মোহনের কৃপায় ও প্রেরণায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা অতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন –"চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২।২৫।২২৯॥" অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে আস্বাদনের আনন্দোন্মাদনা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগৌরলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার মিলনেও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোন্মাদনার আবির্ভাব হয়। এই অপূর্ব্ব আনন্দোন্মাদনাময় মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের সন্ধান শ্রীমন্মহাপ্রভুই দিয়াছেন। ইহাও স্বয়ং ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দররূপের কৃপার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বদান্যতা সর্ব্বাতিশায়ী রূপে প্রকাশ পাইয়াছে – তাঁহার প্রেমদানের দ্বারা ; ভজনাদির অপেক্ষা না রাখিয়া যাহাকে-তাহাকে অযাচিত ভাবে তিনি ব্রজপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। এমন করুণা এবং এমন বদান্যতা—অন্য স্বরূপের কথা তো দূরে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন রূপেও ভগবান্ প্রকাশ করেন নাই। মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি।

৬৫। **সর্ব্বভাবে**— সর্ব্বপ্রকারে ; যথাবস্থিত দেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত দেহে ; সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা।

অথবা, সর্ব্বভাবে – দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই চারি ভাবের সকল ভাবেই। এই চারি ভাবের যে কোনও একভাবে যিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইতে অভিলাষী, তাঁহাকেই তদনুকূলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিতে হইবে ; তাহা হইলেই, তিনি নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া, অভীষ্ট কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

৬৬। **কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব**—রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কূর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া-ছিলেন সেই কথা।

৬৭। **এই লীলা**—কূর্ম্মাকার-ধারণ-লীলা। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজগোস্বামিচরণ কূর্ম্মাকার-লীলা-বর্ণনের উপাদান কোথায় পাইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর অপ্রকট-সময় পর্য্যন্ত নীলাচলে, প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যেই ছিলেন ; স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবাও করিয়াছেন। নীলাচলের সমস্ত লীলাই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং ঐ সকল-লীলায় প্রভুর সেবাও তিনি করিয়াছেন। কূর্ম্মাকার-লীলাও তিনি দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া স্বরচিত-গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্প-বৃক্ষ-নামক গ্রন্থে তিনি এই লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন (নিম্নোদ্ধৃত অনুদ্‌ঘাট্য ইত্যাদি শ্লোকে)। কবিরাজ গোস্বামী দাস-গোস্বামীর নিকট শুনিয়া এবং তাঁহার গৌরাঙ্গ-স্তবকল্প-বৃক্ষ দেখিয়া এই লীলা-বর্ণনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

স্বগ্রন্থে—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিজের রচিত গ্রন্থে, গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে। **গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ**—দাস গোস্বামীর স্বরচিত গ্রন্থের নাম।

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ ;—(৫)—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মা-
কারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপ-নাম
সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভিত্তিত্রয়ং প্রাচীরত্রয়ং এতেন ত্রিকক্ষাবাটীয়ং তত্র তৃতীয়কক্ষায়াং প্রভোর্বাসস্থানং বায়ুাগমনার্থং তত্ত্বনাবৃত-মিত্যায়াতম্ এতেন "তিন দ্বারে কপাট প্রভু" ইত্যাদৌ দ্বারপদেন প্রাচীরদ্বারমিতি সর্ব্বং সুসঙ্গতম্ ভাবান্তরব্যাখ্যাতু ন সঙ্গতা। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫। অন্বয়। দ্বারত্রয়ং (বহির্গমনের তিনটীদ্বার) অনুদ্ঘাট্যচ (উদ্ঘাটন না করিয়াই) অহো (অহো)! উরু উচ্চৈঃ (অতি উচ্চ) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়) বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক) কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে (কলিঙ্গদেশীয়-গাভীগণমধ্যে) নিপতিতঃ (নিপতিত) কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহে) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (দেহের সঙ্কোচের আবির্ভাবে) কমঠঃ ইব (কূর্ম্মের ন্যায়) বিরাজন্ (বিরাজিত) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। (সঙ্কীর্ত্তনাবসানে শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াও যিনি উৎকণ্ঠাবশতঃ গৃহমধ্যে থাকিতে না পারিয়া) তিনটী বহির্গমনদ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াই অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলিঙ্গ-দেশীয় গাভীগণ-মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মহা-বিরহে দেহের সঙ্কোচ আবির্ভূত হওয়ায় যিনি কূর্ম্মের ন্যায় খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৫

দ্বারত্রয়ং—গম্ভীরার তিনটীদ্বার, যেগুলি না খুলিলে গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাওয়া যায় না। **ভিত্তিত্রয়ং**—তিনটী প্রাচীর; ছাদের উপরের তিনটী প্রাচীর বা আলিসা (২।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে—কলিঙ্গদেশীয় সুরভি (গাভী) গণের মধ্যে; শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকটে কতকগুলি কলিঙ্গদেশীয় গাভী ছিল; প্রেমাবেশে প্রভু যাইয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়াছিলেন (৩।১৭।১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **কৃষ্ণোরুবিরহাৎ**—কৃষ্ণের (কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার) উরু (অত্যধিক) বিরহবশতঃ; কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে। **তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ**—তনুর (দেহের) উদ্যৎ (আবির্ভূত) সঙ্কোচবশতঃ, হস্তপদাদির সঙ্কোচ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণবিরহই এইরূপ সঙ্কোচনের হেতু; এইরূপ সঙ্কোচনবশতঃ) যিনি **কমঠঃ ইব**—কূর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিলেন, হস্তপদাদি দেহমধ্যে ঢুকিয়া যাওয়াতে যাঁহাকে তখন কূর্ম্মের মত দেখাইতেছিল, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।

কেহ কেহ "অনুদ্ঘাট্যদ্বারত্রয়ম্"-ইত্যাদি বাক্যের এবং "তিনদ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে। ২।২।৭॥"-ইত্যাদি বাক্যের অন্যরূপ অর্থ করিতে প্রয়াস পায়েন। তাঁহাদের অর্থে প্রভুর এই লীলাটী আর বাস্তব লীলা থাকেনা; ইহা হইয়া পড়ে একটী রূপকমাত্র। কিন্তু ইহা রূপক নহে, ইহা সত্য সত্য লীলাই। তাই অন্যরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"ভাবান্তরব্যাখ্যা তু ন সঙ্গতা—অন্যভাবের ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম ২।২।৭-পয়ারের টীকায় প্রকাশ করা হইয়াছে।